Registration No.: S/L/97407 of 2012-13

বিজ্ঞান মনস্ক'র মুখপত্র

সমীক্ষণ

চতুর্দশ বর্ষ❖সংখ্যা - ২❖জুন ২০২৪

সম্পাদকীয় ঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০২৪ – মুনাফার স্বার্থে প্রকৃতি ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র

পরিবেশবাদ বনাম পরিবেশ বিজ্ঞান ঃ 'বৃক্ষরোপণ জলবায়ু সমস্যার সর্বরোগহর দাওয়াই!'

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী ঃ ব্যতিক্রমী বিজ্ঞানী পিটার হিগস প্রয়াত

কুসংস্কার টিকিয়ে রাখে কারা? ঃ নাগমণি – অন্ধবিশ্বাস যেখানে মধ্যমণি

সমাজ দর্পণ ঃ দাভোলকর হত্যার রায়

ঃ সূচিপত্র ঃ

◈ সম্পাদকীয় ঃ ২

◈ সমাজ দর্পণ ঃ

◆পরিবেশ দিবসের প্রাক্কালে জনজীবনের পরিবেশ ৪

◆দাভোলকর হত্যার রায় ৩৪

◈ সমীক্ষা ঃ ১৮

◆পটল চাষ ঃ চাষীরা কতটা লাভবান হচ্ছেন ?

◈ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী ঃ ১৩

◆ব্যতিক্রমী বিজ্ঞানী পিটার হিগস প্রয়াত

◈ প্রশ্ন ও উত্তর ঃ ২২

◆খাবারের স্বাদের সঙ্গে গন্ধের যোগ আছে কি?

◈ কুসংস্কার টিকিয়ে রাখে কারা? ঃ ২৩

◆নাগমণি ঃ অন্ধবিশ্বাস যেখানে মধ্যমণি

◈ পাঠকের কলাম ঃ ২০

◆ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি এবং সাধারণ মানুষ!

◆বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে সচেতন হোন!

◈ বিজ্ঞানের খবর ৩৫

◈ পরিবেশবাদ বনাম পরিবেশ বিজ্ঞান ঃ ৬

◆'বৃক্ষরোপণ জলবায়ু সমস্যার সর্বরোগহর দাওয়াই!'

◈ ধারাবাহিক নিবন্ধ ঃ ২৯

◆মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ

◈ সংগঠন সংবাদ ৩৮

◈ ছড়া ঃ ৩৯

◆ভূতের ডেরায় হানা

সম্পাদকীয় ঃ

বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০২৪
মুনাফার স্বার্থে
প্রকৃতি ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র

প্রতি বছর ৫ই জুন দিনটিকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসাবে পালন করা হয়। এই দিনটিকে কেন্দ্র করে প্রতিটি দেশের রাষ্ট্রনায়কেরা জনগণের জন্য একরাশ উপদেশের ডালি নিয়ে হাজির হয়। বাসস্থানকে আবর্জনামুক্ত রাখা, বৃক্ষছেদন না করে গাছ লাগানো, জীবাশ্ম জ্বালানীর বদলে সৌর শক্তি ব্যবহার করা, প্লাস্টিকের ব্যবহার বর্জন করা, জমিতে কৃত্রিম সার ব্যবহার না করে জৈব সার ব্যবহার করা, ফসলের ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গ মারার জন্য কীটনাশক ব্যবহার না করা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে পরিবেশকে নির্মল বানানোর গুরুদায়িত্ব জনগণের উপর অর্পন করে তারা। তারা প্রচার করে, উপরে উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞা মেনে না চলার জন্য পৃথিবীর বায়ুমন্ডল অতিমাত্রায় দূষিত হয়ে যাচ্ছে যার ফলে ঘটে চলেছে বিশ্বউষ্ণায়ন, যার প্রধান দায় বর্তায় সাধারণ মানুষের উপর। তারা আরও প্রচার করে, এইভাবে চলতে থাকলে অচিরেই পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পেতে এমন পর্যায়ে চলে যাবে যে পৃথিবীর বুকে জমে থাকা বরফ গলে গিয়ে পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা জলের নিচে তলিয়ে যাবে, বহু জনপদ ধ্বংস হয়ে যাবে। শুধু এইদিনেই নয়, সারা বছর ধরেই রেডিও, টিভি, সংবাদপত্র সহ সমস্ত সমাজ মাধ্যমে জনগণের উদ্দেশ্যে এই ধরনের সতর্কবাণী বর্ষিত হয়। তারা মানুষকে সাবধান করে এই কথা বলে যে, তাদের দেখানো পথে না চললে আগামীদিনে পৃথিবীতে নেমে আসবে চরম বিপদ। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে পরিবেশের ক্ষতি করে এমন সব সামগ্রী বর্জন করে পরিবেশ-বান্ধব পণ্য ব্যবহার করার নিদান দেয়। রাষ্ট্র সঙ্ঘের পরামর্শ অনুযায়ী দেশে দেশে পরিবেশ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। স্কুল কলেজের পাঠ্যে 'পরিবেশ-বিদ্যা'-র নামে তাদের সৃষ্টি করা দিশায় ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষিত করা হচ্ছে। দেশে দেশে পরিবেশবাদী সংগঠন ও বিভিন্ন এজেন্সী গঠন করে তাদের মাধ্যমে রাষ্ট্রগুলি তাদের নীতি প্রয়োগ করে চলেছে। দেশে দেশে বহু পরিবেশ বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান সচেতন মানুষ যারা এই তত্ত্বের বৈজ্ঞানিকভাবে বিরোধিতা করছেন তাদের পরিবেশ তথা সমাজ তথা মানবতার শত্রু হিসাবে দাগিয়ে দেওয়ার নানান প্রচেষ্টাও চালানো হচ্ছে।

রাষ্ট্র সঙ্ঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলির উদ্যোগে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের

৫ই জুন সুইডেনের স্টকহোম শহরে প্রথম পালিত হয় বিশ্ব **মানব-পরিবেশ সম্মেলন**। পরবর্তীকালে, সেই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতি বছর এই দিনটি বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসাবে পালন করা হবে ঘোষণা করা হয়। অর্থাৎ, শুরু থেকেই উদ্যোক্তারা **'মানব'** শব্দটিকে বর্জন করে দিয়েছে। এর অর্থ, এই কর্মকান্ডে মানব-পরিবেশের উন্নতি ঘটানোর কোন কর্মসূচী তাদের নেই। প্রকৃত মানব-পরিবেশ বলতে কেবলমাত্র সমাজের প্রতিটি মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান, কর্মস্থান, দূষণমুক্ত সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলাকেই বোঝায় না, প্রতিটি জনগণের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষার ও কাজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন পরিবেশ গড়ে তোলাকেও বোঝায়। অথচ, ৫০ বছর অতিক্রান্ত হবার পরও, অধিকারগুলি ক্রমশঃ চলে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। অনাহার, অর্দ্ধাহার, অপুষ্টি, বেকারত্ব, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অপসংস্কৃতির অন্ধকারে ডুবে রয়েছে বিশ্বের আপামর মানুষ। মানুষ হল পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যার অধিকাংশই হল খেটে খাওয়া শ্রমজীবী জনতা। তাদের শ্রমে গড়ে উঠেছে মানব-সভ্যতার ভিত। যে ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আছে বর্তমান দুনিয়া। ক্ষেত, খামার, কল, কারখানা, খনি সহ সমস্ত উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রম দান করে তারা বিপুল সামাজিক সম্পদ গড়ে তুলেছে ও তুলছে। অথচ সেই সম্পদের উপর শ্রমজীবী জনতা তথা সাধারণ মানুষের কোন অধিকার নেই।

অন্যদিকে, দেশের সমস্ত জল-জঙ্গল-জমি-কল-কারখানা-খনিজ সম্পদের উপর একচেটিয়া অধিকার কুক্ষিগত হয়ে রয়েছে ধনী, অতিধনী মালিক ও সরকারের হাতে। তাদেরই প্রয়োজনে তারা অপরিকল্পিতভাবে জঙ্গল সাফাই করে, অবাধে জমি ভরাট করে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করে চলেছে। একদিকে নিজেদের তৈরী করা আইনকে অমান্য করে কলকারখানা খনিতে উৎপাদন করছে, অন্যদিকে মানুষকে পরিবেশ-প্রেমী হয়ে ওঠার শিক্ষা দিচ্ছে। আর পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী করা হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। বর্তমান মালিকী ব্যবস্থায় কোন আইনই মালিকদের জন্য প্রযোজ্য নয়। তাই আমরা দেখি, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ভয়াবহ ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনায় হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হওয়া সত্ত্বেও, অভিযুক্ত ইউনিয়ন কার্বাইডের মালিকের কোন শাস্তি হয়নি। জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরের পরমাণু বোমা বিস্ফোরণে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ হানি হয়েছিল, ধ্বংস হয়েছিল প্রকৃতির এক বিশাল অংশ। যার প্রভাবে আজও জন্ম নিচ্ছে বিকলাঙ্গ শিশু। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘটে চলা যুদ্ধের কারণে পরিবেশ কলুষিত হয়ে চলেছে অবিরত। যার অপরাধে আজ পর্যন্ত কারুর শাস্তি হয়নি। কল-কারখানায় ও অন্যান্য উৎপাদনক্ষেত্রে দূষণ নিয়ন্ত্রণের যে বৈজ্ঞানিক রূপরেখা বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে তা কতজন মালিক মেনে চলেন?

বিদ্যমান পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় নেমে এসেছে এক চরম সংকট, যার থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় খুঁজে পাচ্ছেনা বিশ্বের শাসকবর্গ। তাদের দ্বারা গ্রহণ করা সমস্ত পদক্ষেপ অকার্যকরী প্রমাণিত হচ্ছে। এই সংকট থেকে মুক্তির অভিনব উপায় হিসাবে হাজির করা হয়েছে, পরিবেশ সংকট, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা ইত্যাদি। আজকাল জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলার নাম করে আবির্ভূত হয়েছে 'সবুজ রাজনীতি'র। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকার, রাষ্ট্র সংঘ ও নানান আন্তর্জাতিক সংগঠনের তত্ত্বাবধানে দেশে দেশে তৈরী হচ্ছে 'গ্রীন পার্টি'। তাদের ঘোষিত প্রধান লক্ষ্য হল – পরিবেশ সুরক্ষা, জনসংখ্যা হ্রাস এবং পৃথিবীর স্বাভাবিক জীবজগতের সুরক্ষা। তাদের বাণিজ্য নীতির উল্লেখযোগ্য দিকগুলির মধ্যে রয়েছে উৎপাদন হ্রাস ও পণ্যের পুনর্ব্যবহার। ভারতেও একই অঙ্গীকার নিয়ে, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয়েছে সবুজ পার্টি। বিশেষজ্ঞরা এই অর্থনীতিকে 'সবুজ সাম্রাজ্যবাদ' বা 'পরিবেশবাদী সাম্রাজ্যবাদ' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, যার মূল লক্ষ্য হল, প্রকৃতিকে রক্ষার নাম করে বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা বা সবুজের আত্মসাৎ করা'।

বিশ্বজুড়ে পরিবেশবাদী সংগঠনগুলি আদাজল খেয়ে লেগে পড়ে সাধারণ মানুষকে তাদের যুক্তির স্বপক্ষে প্রভাবিত করার জন্য। প্রতি বছর ভিন্ন ভিন্ন থিম বা প্রতিপাদ্য নিয়ে এই দিনটিতে তারা হাজির হয় জনতার দরবারে। ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হল, জমি পুনরুদ্ধার, মরুকরণ ও খরা সহনশীলতা। তাদের এই প্রচার কর্মসূচীর কেন্দ্রস্থল হল মধ্য প্রাচ্যের মরুদশেগুলি। এই প্রতিপাদ্যের দুটি দিকের একটি হল মরু ও খরা প্রবন অঞ্চলকে সবুজায়ন করে তা ব্যবসা-বাণিজ্যের উপযুক্ত করে তোলা। অন্যদিকে, এই সবুজায়ন কর্মযজ্ঞে শ্রমদানে নিযুক্ত শ্রমজীবী জনতাকে শিক্ষা দেওয়া হবে কিভাবে শুষ্ক অঞ্চলের জলবায়ুর সাথে সহনশীল হওয়া যায় বা মানিয়ে নেওয়া যায়। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের এক বড় অংশ মনে করেন কৃত্রিমভাবে এক-প্রজাতির উদ্ভিদের চাষের মাধ্যমে বাস্তুসংস্থান গড়ে তোলার পদ্ধতিটি হল চরম অবৈজ্ঞানিক যা প্রকৃতির ধ্বংসেরই সামিল। কারণ, বাস্তুসংস্থান হল বহু-প্রজাতির মধ্যেকার এক আন্তঃসম্পর্কীয় ব্যবস্থা যা প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা সবুজায়নের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। তাই, 'মরু, বিজয়ের কেতন' ওড়ানোর আন্তরালে বাস্তুসংস্থান নয়,

●*শেষাংশ ১২ পৃষ্ঠায়*

সমাজ দর্পণ ঃ

পরিবেশ দিবসের প্রাক্কালে জনজীবনের পরিবেশ

প্রতিবছর ঘটা করে বিশ্বজুড়ে পরিবেশ দিবস পালন হয়। কিন্তু তাতে মানুষের কোন কথা থাকে না। এবছর ৫ই জুন পরিবেশ দিবস পালনের আগে সাধারণ মানুষ কোন পরিবেশে বাস করেন তার টুকরো কয়েকটি ছবি তুলে ধরা হল।

শিলিগুড়িতে বিষাক্ত পানীয় জল সরবরাহ করেছে পুরসভা

উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি শহরে ও শহরতলীর কিছু অংশে তিস্তা নদী থেকে মহানন্দা লিংক ক্যানাল দিয়ে জল মহানন্দা নদীতে এনে ফুলবাড়ি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে পরিশুদ্ধ করে সরবরাহ করা হয়। এই জল কতটা পরিশুদ্ধ তা নিয়ে বরাবরই প্রশ্ন ছিল। গত ১০ই মে ২০২৪, গাজোলডোবায় (জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত) তিস্তা বাঁধ মেরামতির জন্য ক্যানাল দিয়ে মহানন্দা নদীতে জল সরবরাহ বন্ধ রাখা হয়। শহরে জলসংকট হতে পারে এই আশংকায় শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল কর্পোরেশন সিদ্ধান্ত নেয় ক্যানালের জমা জল এবং মহানন্দায় ইনটেক ওয়েল থেকে জল নিয়ে তা সরবরাহ করা হবে। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞরা এই জল কতটা বিশুদ্ধ হবে তা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করলেও মেয়রসহ কর্পোরেশন তাতে গুরুত্ব দেয় নি। কিন্তু দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের রিপোর্ট ২৯শে মে হাতে আসার পর মেয়র শহরবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়ে জলপান করতে নিষেধ করেন। রিপোর্টে দেখা যায় প্রতি লিটারে বিওডি (বায়োকেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড) রয়েছে ২.৯ মিলিগ্রাম। বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে এর অর্থ হল জলে পচাগলা জৈব পদার্থ রয়েছে। এর ফলে উৎপন্ন আণুবিক্ষণিক জীব বা মাইক্রোব জলের অক্সিজেন টেনে নেয়। পানযোগ্য জলে বিওডি-র মাত্রা শূন্য হওয়া প্রয়োজন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনোলজি বিভাগের একদল গবেষক মহানন্দার দূষণ নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করছেন। তাঁরা গত ১৬ই মে সকাল ৯.৩০ টায় এবং বিকাল ৫ টায় মহানন্দার জল সংগ্রহ করেন। পরীক্ষায় তাঁরা দেখেন যে সকালের জলে প্রতি মিলিলিটারে ৭৯ লক্ষ বায়বীয় ব্যাকটেরিয়া রয়েছে যার মধ্যে ৩৮০০টি সুপারবাগ (এমন ব্যাকটেরিয়া যা অধিকাংশ অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ করতে সক্ষম) বিকালের জলে রয়েছে ৫৪ লক্ষ ব্যাকটেরিয়া যার মধ্যে ১২৩০০টি সুপারবাগ। এই বায়োটেকনোলজি বিভাগের প্রধান রণবীর চক্রবর্তী উত্তরবঙ্গ সংবাদ (৩১/০৫/২০২৪) বলেছেন, 'মহানন্দার জল দূষণের সমস্ত মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে ... জলের ইকোলাই পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা উচিৎ।' ইকোলাই এর সংখ্যা জানার জন্য 'মিন প্রবাবল নাম্বার' (এমপিএন) পরীক্ষা করা হয় ১০০ মি.লি. জলে তার সংখ্যা জানার জন্য। বিশুদ্ধ জলে এমপিএন এর মান শূন্য হয়। ১-১০ এমপিএন থাকাই ঝুঁকিপূর্ণ। এপ্রিল মাসে মহানন্দার জলে এমপিএন ছিল ১ লক্ষ ১০ হাজার। মে মাসে তা নিশ্চিত বেড়েছে। এই নিয়ে পৌরসভা, প্রশাসন দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড কারও মাথাব্যাথা নেই, কোন হুঁশ নেই।

১৫-২০ দিন ধরে স্নানের অযোগ্য জল পান করেছেন শহরবাসী। এখন সর্বত্র আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। একদিকে হাসপাতালে ভিড় বাড়ছে, পেট খারাপের ওষুধ বিক্রি বাড়ছে আর অন্যদিকে বাড়ছে বোতলের জলের ব্যবসা। এবছর পরিবেশ দিবসের প্রাক্কালে পুরসভা-প্রশাসন জনগণকে অভূতপূর্ব উপহার দিলেন! ■

হরিয়ানার সোনিপতে রাবার কারখানায় ঝলসে গেল ৪৫ জন শ্রমিক!

হরিয়ানার সোনিপত-এ রাবারের বেল্ট তৈরির কারখানায় গত ২৯শে মে ২০২৪ এক ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ঝলসে গেলেন ৪৫ জন কর্মরত শ্রমিক, ৫ জনের অবস্থা গুরুতর। কারখানার একটি বয়লার ফেটে এই ঘটনা ঘটেছে। দেশের কারখানাগুলি এখন যেন জতুগৃহ! পরিবেশ দপ্তর, দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড ইত্যাদিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শ্রমিকদের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা ছাড়াই চলছে অসংখ্য কারখানা। এবছর পরিবেশ দিবসের প্রাক্কালে এটা শ্রমিকদের জন্য উপহারই বটে! ■

(তথ্যসূত্র ঃ দৈনিক স্টেটসম্যান, ৩০/০৫/২০২৪)

মহারাষ্ট্রের থানেতে রাসায়নিক কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত ৮ শ্রমিক!

মহারাষ্ট্রের মুম্বইয়ের নিকট থানে'র ডম্বিবেলিতে আমুদান রাসায়নিক কারখানায় বয়লার ফেটে প্রাণ গেল অন্তত ৮ জন শ্রমিকের। অন্তত ৬০ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। প্রায় ভস্মীভূত কারখানা থেকে উদ্ধার কাজ চলছে। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা কত হবে জানা নেই। ■

(তথ্যসূত্র ঃ এই সময়, ২৪/০৫/২০২৪)

তামিলনাড়ুর সার কারখানায় বিষাক্ত অ্যামোনিয়া গ্যাস লিক

গত ২৬শে ডিসেম্বর ২০২৩, তামিলনাড়ু রাজ্যের এন্নোর অঞ্চলের করমন্ডল ফার্টিলাইসার প্লান্ট (সার কারখানা) তে ১৫ মিনিটের মধ্যে প্রায় ৬৭.৬৩ টন অ্যামোনিয়া গ্যাস লিক হয়ে কারখানার সকল শ্রমিক এবং আশেপাশের ৩৩টি গ্রামের বাসিন্দারা অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় বহু মানুষকে। মৃতের সংখ্যা কত তা গোপন করা হয়েছে। ■

(তথ্যসূত্র ঃ www.newindiaexpress.com)

পরিবেশবাদীদের দাওয়াই –
বিশ্ব উষ্ণায়ন ঠেকাতে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ শুধু নয়
কৃষি এবং পশুপালনও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে!

সম্প্রতি (১২ই জুন ২০২৪) গ্লোবাল কার্বন প্রোজেক্ট সংস্থা একটি তথ্য সামনে এনেছে। এই তথ্যে বলা হয়েছে যে ১৯৮০-২০২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বায়ুমন্ডলে নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O), যাকে লাফিং গ্যাস (হাসি উদ্রেককারী গ্যাস) বলা হয়, তার পরিমাণ ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই নাইট্রাস অক্সাইড হল নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ একটি যৌগ যা কিনা গ্রীণ হাউস গ্যাস হিসেবে বায়ুমন্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধিতে কার্বন ডাই অক্সাইড অপেক্ষা ২৭৩ গুণ অধিক ক্ষমতাশালী। বায়ুমন্ডলে অতি উচ্চমাত্রায় নাইট্রাস অক্সাইডের বৃদ্ধি বায়ুমন্ডলের উর্দ্ধস্তরে উপস্থিত ওজোন (O_3) স্তর পাতলা করে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বিশেষভাবে দায়ী। ইন্টার গর্ভমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি)'র গবেষকরা জানিয়েছেন যে ২০২২ খ্রিস্টাব্দে মনুষ্যজনিত কারণে বায়ুমন্ডলে নিঃসৃত গ্রীণ হাউস গ্যাসের মধ্যে নাইট্রাস অক্সাইড একাই প্রায় ৬ শতাংশ।

গ্লোবাল কার্বন প্রোজেক্ট এর রিপোর্ট অনুসারে বায়ুমন্ডলে নিঃসৃত নাইট্রাস অক্সাইডের ৭৪ শতাংশই আসছে কৃষি উৎপাদন এবং পশুপালন ক্ষেত্র থেকে। কৃষি উৎপাদনে ব্যবহৃত কৃত্রিম সার এবং প্রাণীজাত সার (গোবর ইত্যাদি) থেকে। সমগ্র পৃথিবীতে ফার্মার এবং শ্রমজীবী কৃষকরা ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে ৬ কোটি মেট্রিক টন কৃত্রিম নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ সার এবং ২০.৮ কোটি মেট্রিক টন প্রাণীজ জৈব সার ব্যবহার করে। এর ফলে গত ৪০ বছরে কৃষি এবং পশুপালন থেকে গ্রীণ হাউস গ্যাস (নাইট্রাস অক্সাইড, কার্বন ডাই অক্সাইড নয়) নিঃসরণ ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই নিঃসরণের মাত্রা আয়তনের অনুপাতে যে ৫টি রাষ্ট্র দ্বারা সর্বাধিক, তারা হল – চিন (১৬.৭%), ভারত (১০.৯%), আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (৫.৭%), ব্রাজিল (৫.৩%) এবং রাশিয়া (৪.৬%)। যদিও জনপ্রতি নাইট্রাস অক্সাইড নিঃসরণের মাত্রার হিসাবে রাশিয়া (৩.৩ কি.গ্রা), ব্রাজিল (২.৫ কি.গ্রা), আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (১.৭ কি.গ্রা), চিন (১.৩ কি.গ্রা), ভারত (০.৮ কি.গ্রা) প্রতি বছর।

হানকিন তিয়াং, বোস্টন কলেজের গ্লোবাল সাসটেনিবিলিটির ('বিশ্বের স্থায়ীত্ব') অধ্যাপক এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন "প্যারিস জলবায়ু চুক্তির সিদ্ধান্ত অনুসারে পৃথিবীর গড় উষ্ণতা বৃদ্ধিকে ২° সেলসিয়াসের মধ্যে বেঁধে রাখতে মনুষ্যজনিত কারণে বায়ুমন্ডলে নিঃসৃত নাইট্রাস অক্সাইডের মাত্রাকে কমাতেই হবে। এটাই বিশ্ব উষ্ণায়নকে ঠেকাবার একমাত্র প্রযুক্তি।"

সুতরাং আইপিসিসি, গ্লোবাল কার্বন প্রোজেক্ট এর মত আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী এজেন্সি সংস্থা তথা সমগ্র বিশ্বের শাসকরা বিশ্ব উষ্ণায়ন (এদের সকলের মতেই তা হচ্ছে প্রায় একমাত্র মনুষ্যজনিত কারণে) ঠেকাতে শুধুমাত্র জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহার বন্ধ করে শিল্প উৎপাদন, বিদ্যুৎ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করলেই চলবে না। সমগ্র বিশ্বজুড়ে কৃষি উৎপাদন ও পশুপালনকেও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অর্থাৎ মানব সভ্যতার বিকাশের দ্বার রুদ্ধ করে হাজার হাজার বছর আগেকার অরণ্যবাসী হয়ে প্রকৃতি নির্ভর সমাজে ফিরে যেতে হবে। [তথ্যসূত্র ঃ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ১৩/০৬/২০২৪]

পরিবেশবাদ বনাম পরিবেশ বিজ্ঞান ঃ

‘বৃক্ষরোপণ জলবায়ু সমস্যার সর্বরোগহর দাওয়াই!’

(গত সংখ্যার পরবর্তী অংশ)

বৃক্ষরোপণের দাওয়াই যে রোগ উপশম না করে রোগ সৃষ্টি বা রোগ বৃদ্ধি ঘটাতে পারে এ বিষয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ও তার ফলাফল মজুত রয়েছে। এসব জানা সত্ত্বেও কেন বিশ্ব ব্যবস্থার দন্ডমুন্ডের কর্তারা ঐ দাওয়াই আরো জোরেশোরে লাগু করে চলেছেন সে দিকে নজর দেওয়ার আগে কয়েকটি গবেষণার ফলাফল সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন।

*নতুনভাবে রোপিত অরণ্য বায়ুমন্ডল থেকে কতটা কার্বন শোষন করে তাকে ধারণ করতে পারে? – এই প্রশ্নে বহু সংখ্যক বিজ্ঞানী একটা স্থির অনুপাতের ভিত্তিতে গণনা করে এর পরিমাণ নির্ধারণ করে দেন।

কিন্তু এই অনুপাত স্থানীয় শর্তগুলির উপর নির্ভরশীল এমন অনুমানের ভিত্তিতে গবেষকরা উত্তর চিনের সেই ক্ষেত্রে বিস্তৃত সমীক্ষা চালান যেখানে সরকারের দ্বারা সঘন (intensive) বৃক্ষ রোপণের কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিল জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমিত করা তথা গোবি মরুভূমি থেকে আগত ধুলো নিয়ন্ত্রণ করার জন্য।

ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে মাটির ১১,০০০ নমুনা সংগ্রহ করা হয়। পরীক্ষা করে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে কার্বন সমৃদ্ধ নয় এমন মাটিতে নতুন গাছের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তা জৈব কার্বনের ঘনত্ব বৃদ্ধিতে সাহায্য করে অর্থাৎ এটি বায়ুমন্ডলীয় কার্বন শোষণের উত্তম নমুনা। কিন্তু যেখানে মাটি ইতিমধ্যেই কার্বন সমৃদ্ধ সেখানে নতুন গাছ বৃদ্ধি ঠিক উল্টো ফলাফল দেয়। অর্থাৎ কার্বন ঘনত্ব কমিয়ে দেয়।

গবেষকরা বলছেন নতুন বৃক্ষরোপণ কত জৈব কার্বন ধারণ করে রাখতে পারে এ বিষয়ে পূর্ববর্তী স্থির আনুপাতিক অনুমানগুলি অতিরঞ্জিত।

গবেষণাপত্রের মুখ্য রচনাকার কলোরাডো স্টেট ইউনিভার্সিটির ডঃ অ্যানপিং চেন বলেছেন “অরণ্যসৃজনের জন্য বহু টেকনিক্যাল খুঁটিনাটি বিষয় এবং বিভিন্ন অঞ্চলের ভারসাম্য বিচার করতে হবে – এটা আমাদের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সমস্যার সুসংহত সমাধান দেয় না।

*চেতন মিশর একজন বাস্তুতন্ত্র বিশেষজ্ঞ এবং ভারতের শুষ্ক তৃণভূমি তথা সংশ্লিষ্ট বন্যপ্রাণের উপর গবেষনা করেন। অ্যাবি টি ভনক একজন প্রাণী পরিবেশ ও জীব সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞ। এনারা ‘কেন ব্যাপক বৃক্ষ রোপণ উদ্যোগ মরু বাস্তুতন্ত্রের জন্য বিপর্যয়কর’ – এই বিষয়ে এক গবেষণা পত্র পেশ করেছেন। তার অল্প কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিম্নরূপ –

পৃথিবীর অন্যতম জৈব বৈচিত্রপূর্ণ দেশগুলির অন্যতম – ভারত। এখানে প্রত্যেক ভৌগোলিক অঞ্চল **বাস্তুসংস্থানিক জলবায়ু** (eco climatic) জোনের ভিন্নতাকে ধারণ করে। এরা প্রত্যেকে নিজস্ব অনন্য বাস্তুতন্ত্রকে পোষণ করে। আর্দ্রতম ভারতীয় অঞ্চলগুলিতে আছে বর্ষাবন ও বাদলবন (rain forest ও cloud forest), উপকূলীয় এলাকাগুলিতে আছে **বালিয়াড়ি** (sand dunes), ম্যানগ্রোভ ও প্রবাল প্রাচীর (coral reef), মধ্যভারতের সমভূমি বাঘের আবাসযোগ্য বনাঞ্চলকে ধারণ করে। ভারতের পশ্চিমে শুষ্কতম অঞ্চল – বিরাট থর মরুভূমি – তারও রয়েছে নিজস্ব বাস্তুতন্ত্র। যার গঠন, কার্যকর ভূমিকা – বিশেষতঃ মানব বসতিতে তার প্রভাব এক কথায় অনন্য। সে বহু প্রজাতির আশ্রয়দাতা যারা নির্দিষ্ট আবহাওয়ার অবস্থার সাথে অভিযোজিত হয়েছে।

অথচ এই বাস্তুতন্ত্রকে দীর্ঘদিন ধরে অবক্ষয়িত, বন্ধ্যা ভূমি রূপে চরিত্রায়িত করা হয়েছে। এবং এই বাস্তুতন্ত্রে বাসস্থানগত উন্নতির নামে হস্তক্ষেপ করা হল সহজাত নয় এমন ক্ষতিপূরণকারী বৃক্ষরোপণ মারফৎ।

কিন্তু দশকের পর দশক ধরে বৃক্ষরোপণ অভিযানের পরও এই মরুভূমি বাস্তুতন্ত্রীয় অবক্ষয় ও নিশ্চিহ্নকরণের শিকার। এর কারণ হল এক প্রজাতির উদ্ভিদ যা ভারতের কোন অংশে পাওয়া যায় তাকে সকল বাস্তুতন্ত্রের জন্য সহজাত বলা যায় না।

কোন নির্দিষ্ট (মরু) বাস্তুতন্ত্রে বৃক্ষরোপণ অভিযানের প্রভাবের মাত্রা অনুধাবন করার জন্য গভীর অনুসন্ধান দরকার। ভারতে মরুভূমিগুলির গঠনগত ও কার্যগত ভূমিকা ভিন্ন ভিন্ন । গুজরাতের লবণ মরু, রাজস্থানের বিশাল বালুময় মরু অথবা হিমালয়ের শীত মরু।

*তিব্বতের মালভূমিতে বিস্তৃত সুউচ্চ শীতল মরুর নিজস্ব বাস্তুতন্ত্র রয়েছে। ২০২২ এর বিশ্বপরিবেশ দিবসে লাদাখের প্রত্যন্ত গ্রাম চুসাল এ রেকর্ড দেড় লাখ চারা রোপণ করা হয়েছে,

বাস্তুতন্ত্রকে সুরক্ষিত তথা সংরক্ষিত করার জন্য। ২০১৮-তে লেহ তে ঐ ভাবে ৪০০০ চারা রোপণ করা হয়েছিল। লেহ্‌র কাছে কুলুম গ্রামে বিশালাকার অরণ্য তৈরি করার পরিকল্পনা করা হয়েছে ১.৫ লাখ চারা রোপণ করার মাধ্যমে। জল সংকটের কারণে এই গ্রামের অধিবাসীদের অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়েছে। অনিয়ন্ত্রিত পর্যটন ব্যবসা যে ভৌম জলের উপর অত্যধিক চাপ সৃষ্টি করে সে দিকে নজর না দিয়ে যেখানে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত মাত্র ১০০ মিলিমিটার, বায়ুমন্ডল লঘু এবং মৃত্তিকার উপস্তরগুলি ভঙ্গুর সেখানে এমন দৈত্যাকার বনসৃজন ভূমিক্ষয় সহ দীর্ঘকালীন বাস্তুসংস্থানগত প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। বর্ধিত বাষ্পমোচনের কারণে ভৌম জলের স্তরকে আরো নিচে নামিয়ে দিতে পারে।

বৃক্ষরোপণের জন্য যে জায়গাগুলি বেছে নেওয়া হয়েছে তা উপত্যকার বাইরে এবং স্বাভাবিক বৃক্ষসারির (tree line) উপরে অবস্থিত। যেখানকার জলবায়ু গাছের টিকে থাকার জন্য অনুপযুক্ত।

লাদাখের শীতমরুর বাস্তুতন্ত্র ন্যাড়া, ঢেউ খেলানো পর্বতের বৈশিষ্ট্যযুক্ত। হিমবাহগুলির দ্বারা পোষিত মরশুমি ঝরণাই হল জলপ্রাপ্তির প্রধান উপায়। এই আপাত বন্ধ্যা সুউচ্চ অঞ্চলসমূহ এক অনন্য জীব বৈচিত্রকে ধারণ করে। তুষার চিতা, বুনো ছাগল (আইবেক্স) ও নীল ভেড়ার বাসভূমি। স্থানীয় মানব জনসমষ্টিও এই চরম আবহাওয়ার সাথে মানিয়ে নিয়েছে। এই অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহকে তোয়াক্কা না করে বিপুল বৃক্ষ রোপণ অভিযান জলবায়ু প্রশ্নগুলির মোকাবিলা না করে ভঙ্গুর লাদাখ বাস্তুতন্ত্রে বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে।

* কচ্ছের (গুজরাত) বান্নি তৃণভূমিতে বৃক্ষরোপণ অভিযান এমন নেতিবাচক ফল বার করে এনেছে। এশিয়ার মধ্যে একটি চমৎকার ক্রান্তীয় তৃণভূমি হল বান্নি। কিন্তু তার তৃণ আচ্ছাদন বিগত কয়েক দশকে হ্রাস পেয়েছে। মরুকরণ (desertificatcion) রোধ ও মাটির লবণাক্ততা হ্রাস করার জন্য ছোট ঝোপ (shrub) জাতীয় গাছ প্রসোপিস জুলিফ্লোরা আগ্রাসীভাবে লাগানো হয়েছে। ঐ ঝোপ স্থানীয় তৃণ উৎপাদন কমিয়ে দিয়ে অর্ধেকের বেশি অঞ্চল কাষ্ঠল বনভূমিতে পরিবর্তন করেছে। তৃণভূমিকে আশ্রয় করে থাকা সহজাত বন্যপ্রাণকে বিরাটভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। পশুপালক মালধারী জনগোষ্ঠীকে জীবিকা পরিবর্তনে বাধ্য করেছে।

শুধু তাই নয় পরবর্তী অধ্যয়নে দেখা গেছে যেখানে প্রোসোপিস এর ঘন আচ্ছাদন সৃষ্টি করা হয়েছে সেখানে জলস্তর নিচে নেমে গিয়েছে এবং লবণাক্ততা বেড়েছে অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায়। মরুকে অবক্ষয়ের নামান্তর ধরে সেটা এই অনন্য ভূমিরূপের প্রতি 'অন্যায়'। মরুভূমিকে সবুজ করা আসলে মরুর অবক্ষয়। **সব ধূসরই খারাপ নয় আর সবুজ মাত্রেই ভাল নয়!**

*ফ্লোরিডা স্টেট ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো ও দেহরাদুনের সেন্টার ফর ইকোলজি ডেভলপমেন্ট অ্যান্ড রিসার্চের যৌথ উদ্যোগে এক গবেষণা চালানো হয়। যাতে অত্যাধুনিক স্যাটেলাইট প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার মূল লক্ষ্য ছিল দুটি। অরণ্যের আচ্ছাদন (forest Canopy cover) ও অরণ্যের উপাদান। গবেষণার মূল ক্ষেত্র ছিল হিমাচল প্রদেশের কাংড়া উপত্যকা – যেখানে ১৯৬৫-র পর থেকে ব্যাপক আকারে বৃক্ষরোপণ অভিযান চালানো হয়েছে অরণ্য আচ্ছাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে।

গবেষণালব্ধ ফলাফলে দেখা যায় যেখানে ৪০% র বেশি অরণ্য আচ্ছাদন ছিল সেখানে বৃক্ষরোপণের ২০ বছর পরও আচ্ছাদনের ঘনত্ব আর বাড়েনি।

অন্যদিকে সহজাত চওড়া পাতার গাছের বিভিন্ন প্রকারের বদলে সূচ্যগ্র পাতার গাছের অনুপাত ১০% বেড়েছে। আগের প্রকারের গাছ পশুখাদ্য ও জ্বালানী কাঠ হিসেবে স্থানীয় মানুষ ব্যবহার করত। পরিবর্তিত পাতার প্রজাতি ততটা উপযোগী নয়। স্থানীয় মানুষের জীবিকার সহায়ক নয়। সরকারের উচ্চ স্তরে নেওয়া 'উচ্চাকাঙ্খী' প্রকল্প স্থানীয় স্তরের বন আধিকারীকদের পক্ষে লাগু করা এক চ্যালেঞ্জ।

মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড ন্যাচারাল রিসোর্স পলিসি বিভাগের অ্যাসেসিয়েট প্রফেসর এফ. ফ্লিসম্যান – যিনি এই গবেষণাপত্রের সহ রচনাকার – তাঁর বক্তব্য হল –

"ভারত বড় মাত্রায় অরণ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালাচ্ছে কয়েক দশক ধরে। আমরা সবেমাত্র একটি প্রথম প্রণালীবদ্ধ মূল্যায়ন প্রকাশ করেছি এই প্রয়াসের। আমরা খুঁজে পেয়েছি দশকের পর দশক ধরে বৃক্ষরোপণ কার্যত অরণ্য আচ্ছাদন এবং গ্রামীণ জীবিকার ক্ষেত্রে কোন প্রভাবই সৃষ্টি করতে পারে নি। কয়েক দশক পরে যখন ধরে নেওয়া যায় রোপিত চারা পুরোমাত্রায় বেড়ে উঠেছে এবং আচ্ছাদনের অনুপাতে পরিবর্তন ঘটাতে পারে – তখনও কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় নি। সুতরাং একদম বুনিয়াদি ক্ষেত্রে বৃক্ষরোপণ অরণ্য বৃদ্ধিতে কোন কাজে লাগেনি।"

তিনি আরো বলেন "বনবিভাগ বৃক্ষরোপণের অনুকূল জায়গা চিহ্নিত করতে অপারগ। যে জমি বাছা হচ্ছে তা পরিকল্পিত প্রোগ্রামে নির্দিষ্ট গাছ লাগানোর উপযোগী নয়। হিমাচলে সরকার

যা রোপণ করতে চায় তেমন গাছ লাগানোর উপযুক্ত জায়গা নেই।

*গবেষকদের তথ্য বিশ্লেষণ করে স্বয়ং ভারত সরকারের কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (সি. এ. জি) রিপোর্ট ২০১৩ বলেছে অনুপযুক্ত জায়গায় বৃক্ষরোপণ টিকতে পারে না। বিহারের জামুই ডিভিশনে ২৩ লাখ টাকা খরচ করে লাগানো চারার মাত্র ৫০% বেঁচেছে। হিমাচল প্রদেশে দুটি ফরেস্ট কার্বন প্রকল্প (বিশ্বব্যাঙ্ক নির্ধারিত প্রকল্প) এবং হরিয়ানার (ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও রাজ্য বনবিভাগের যৌথ প্রকল্প) প্রকল্পের মূল্যায়ন করেন আই. আই. এম-এর অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর আশিস আগরওয়াল। তিনি দেখান উভয় প্রকল্পে কার্বন সিকোয়েস্ট্রেশন হল আনুমানিক লক্ষ্যের ৩৭% (হরিয়ানা) ও ৩% (হিমাচল প্রদেশ)।

এই প্রকল্পের খরচ ছিল খুবই বেশি। হিমাচলে বৃক্ষরোপণ বাজেটের [৫.৬৭ মিলিয়ন ডলার বা ৪৫.৩৬ কোটি টাকা (প্রায়)] ৪০ শতাংশ (১৮ কোটি টাকার বেশি) এমন জায়গায় অরণ্যসৃজনে খরচ হচ্ছে যেখানে গাছের ঘনত্ব মধ্যম থেকে উচ্চ। যেমন – চারগতি। ৪৮ শতাংশ বৃক্ষরোপণ খরচ চন্দ্রভাগা নদীর **গিরিখাতে** (gorge) যেমন কিল্লার। [অধ্যয়নের সহ রচনাকার ফরেস্ট সার্ভিসের কর্মরত আধিকারীক পুষ্পেন্দ্র রাণা হলেন 'হিমাচলের পরিপ্রেক্ষিতে এই এলাকাগুলি তুষার পাহাড় ও মরু এলাকা যেখানে পরিবেশগত অবস্থা গাছের বৃদ্ধির পক্ষে বাধা']

বৃক্ষরোপণ বাজেটের আরেক খাবলা (৩৩%) ব্যয় করা হয়েছে একদম দক্ষিণ দিকে যেমন – বেহনোতা। যেখানের শুষ্কতা গাছের বৃদ্ধি আটকে দেবে। রাণা বলেন "এই এলাকাগুলি সারাবছর প্রত্যক্ষ সূর্যকিরণ লাভ করে এবং শুষ্ক। এর বিপরীতে ছায়াবৃত এলাকাগুলিতে আর্দ্রতা আছে ও গাছ বাড়তে পারে।'

২৮.৯% খরচ করা হয়েছে অনির্ণীত বনাঞ্চলে যেখানে জমির অধিকার নিয়ে বিবাদ বর্তমান। এটা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করবে যা প্রকৃতপক্ষে অরণ্য আচ্ছাদনে ক্ষতি করে।

কেবলমাত্র ১% খরচ করা হয়েছে জনগোষ্ঠীগত পরিচালনাধীন অরণ্যে।

প্রকল্পের ১৪.১% খরচ ফলদায়ী হতে পারে কারণ এগুলো কম ঘনত্বের অরণ্য (১০% থেকে ৪০% ঘনত্ব) এলাকায় করা হয়েছে যেগুলো আসলে অবক্ষয়িত বনভূমি এবং অরণ্য পুনর্নির্মাণের উচ্চ সম্ভাবনা যুক্ত।

রাণার বক্তব্য হল 'বিচক্ষণতার পরিচয় দেওয়া যেত যদি লক্ষ্যটা হত জৈব বৈচিত্র বাড়ানো এবং আমাদের দরকার হল অনেক বেশি প্রজাতির গাছ কিন্তু রোপিত বৃক্ষ মাত্র কয়েকটি প্রজাতির।' প্রধানতঃ পাইন প্রজাতি পছন্দ করা হয় কিন্তু স্থানীয় মানুষ পছন্দ করেন না ঘাস গজাতে দেয় না বলে। জনগোষ্ঠীগত অংশগ্রহণ না থাকার এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

এই অধ্যয়ন এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে ফরেস্ট কার্বন প্রকল্প যে সামাজিক ও আর্থিকভাবে নয় তা ভারত সরকারের গোচরেই আছে। সি.এ.জি রিপোর্ট তাই বলে।

*বন অধিকার কর্মী ও গবেষক তুষার দাস বলেন "কার্যক্ষেত্রে এমন বহু উদাহরণ পাওয়া যাবে অপচয়মূলক খরচ ও ভূতুড়ে বনসৃজনের। সিএজি রিপোর্টে দেখানো হয়েছে ক্ষতিপূরণমূলক বননির্মাণে অতি কম রোপিত গাছ বেঁচে থেকেছে। বেমানান জায়গায় রোপিত বৃক্ষ বাঁচেনা। (যেমন ছত্তিশগড়ের হারদিতে সেগুন গাছ রোপণ করার প্রকল্প)। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ভূমিব্যবহার, ভূমিব্যবহার পরিবর্তন ও অরণ্য বিভাগে এই জোর দেওয়ার কারণ তারা কয়লা ও খনি ক্ষেত্রে মোকাবিলা করতে চায় না। কেবল জমি ও অরণ্য ক্ষেত্রে এটার দায় চালান করতে চায়। ... গ্লাসগো সম্মেলন ও প্যারিস সমঝোতায় যে লক্ষ্য পূরণের দায়বদ্ধতা (রাষ্ট্রগতভাবে নির্ধারিত অংশদান এন.ডি.সি) পেশ করা হয়েছে তার কোন বিজ্ঞান সম্মত ভিত্তি নেই। **এখন যে বিপুল বৃক্ষরোপণ চলছে তা অপচয়মূলক খরচ এবং আর্থ সামাজিক ও অধিকার সম্বন্ধীয় সংঘাত সৃষ্টি করছে আদিবাসী ও বনবাসীদের সাথে।**' (জোর সংযোজিত)

বৃক্ষরোপণ ও অরণ্যসৃজনের বিজ্ঞানকে এফ. ফ্লিসম্যান ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে – 'যদি কোন প্লট এখন অরণ্যাবৃত না থাকে বা অরণ্যমান নিম্নস্তরের থাকে তবে অরণ্যনির্মাণের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে হলে প্রথম প্রশ্ন হবে – কি কি কারণে এখন এখানে অরণ্য নেই। এই না থাকার কারণ নির্দিষ্ট হলে দ্বিতীয় প্রশ্ন হবে – এই না থাকাকে কি কোন অবাঞ্ছিত ক্ষতি না করে শুধরানো যায়? যে যে জায়গা প্রকৃতিগতভাবে অরণ্যের অনুকূল নয় (যেমন প্রাকৃতিক তৃণভূমি) সেখানে রোপণ করা উচিৎ নয়। অন্য ক্ষেত্রে অরণ্য নেই কারণ মানুষ সেটা কৃষিজমি বা পশুচারণভূমি রূপে ও কাঠ সামগ্রী ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে। এই ক্ষেত্রে প্রথম কী প্রকারে জমির এমন ব্যবহার কমানো যায় (যেমন বিকল্প চারণভূমির ব্যবস্থা করে) তা ভাবতে হবে – যাতে নিশ্চিত করা যায় যে ঐ ক্ষেত্রে বননির্মাণ করা যাবে।

অরণ্য না থাকার সামাজিক পরিবেশগত বিষয়গুলি বোঝার পর ঐ ক্ষেত্রের আকাঙ্খিত ভবিষ্যৎ বা লক্ষ্য কী তা স্থির করতে

হবে। সেটা কি বাণিজ্যিক উৎপাদন নাকি প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জ পুনরুদ্ধার করা না কি জীবিকা সম্পর্কিত উৎপাদন? অথবা জলস্তর বা বন্যপ্রাণ সম্বন্ধীয়? এটা ঠিক হলে সর্বাধিক কম খরচে লক্ষ্য পূরণের রাস্তা খুঁজতে হবে। নির্দিষ্ট প্রজাতির গাছ রোপণ করার ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে বীজ সংগ্রহ করা, চারাগাছ পশু ও আগুন থেকে রক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ। ... ভারতের মত দেশে যেখানে অরণ্য নির্ভর জনগোষ্ঠী আছে – তাদের বিষয়টাও গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্ত ব্যবস্থা এবং খরচ ও ফলাফল এখন সবই নিখুঁতভাবে করা যায়।'

এ হল বৃক্ষরোপণ ও বনসৃজনকে সফল করার জন্য বৈজ্ঞানিক পরামর্শসমূহ। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থা যে কোন প্রকল্প বিজ্ঞানীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। কিভাবে হয় সেটা বিচার করা উচিৎ।

বিজ্ঞানীদের উপরোক্ত পরামর্শ প্রসঙ্গে ভারত সরকারের পরিবেশমন্ত্রকের বক্তব্য হল 'ভারত প্রাইভেট বনসৃজনকেও উৎসাহ দেয়। দেখা হল স্থানীয় জনতা ও প্রাইভেট সংস্থা যাতে উপকৃত হয়। আমরা চাই চাহিদা অনুযায়ী কাঠ (টিম্বার)। তাই এমন নীতি প্রণয়ন করছি যা প্রাইভেট বনসৃজনকে সহজতর করে এবং স্থানীয় লোক যখন দরকার কাঠকে ফসল হিসেবে সংগ্রহ করতে পারে। এটা জলবায়ু মোকাবিলাও করতে পারে।

এই স্পষ্ট উদ্দেশ্য সম্পর্কে সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চের গবেষক কাঞ্চী কোহলী বলেন "১৯৭০ থেকে সরকার নেতৃত্বাধীন অরণ্যসৃজন এর ইতিহাসটা বিরক্তিকর। এটা বার বার বাস্তুসংস্থানগত অন্ধত্ব এবং জনগোষ্ঠীগত অধিকারগুলিকে উচ্ছেদ করার জন্য সমালোচিত হয়েছে। ... এগুলির মধ্যে রয়েছে সামাজিক বনসৃজন প্রকল্প, সংযুক্ত অরণ্য ব্যবস্থাপনা ও বৃহদাকার বৃক্ষরোপণ উদ্যোগ। জলবায়ু মোকাবিলার নামে এ সকল প্রকল্প চালানো হয়। বৃক্ষরোপণ উদ্যোগ নীতিগতভাবে বৈধতা দিয়েছে ক্ষতিপূরণমূলক অরণ্যসৃজন (compensatory afforestation) এর পদ্ধতিকে। এই পদ্ধতি জৈব বৈচিত্রপূর্ণ বনাঞ্চল ক্ষয়ের প্রক্রিয়ায় ন্যায্যতা প্রদান করে।"

বৃহৎ বৃক্ষরোপণ উদ্যোগ কৃষিজবন (agro forestry) ও বাগিচা (plantation) এর সাথে যুক্ত যেখানে লক্ষ্য হল নির্দিষ্ট সময়ের পর গাছ কেটে ফেলা। (তাদেরই বক্তব্য অনুযায়ী এই প্রক্রিয়া জৈব কার্বন মুক্ত করে দেবে!) প্রধানতঃ পাঁচটা বৃক্ষ প্রজাতি বাছাই করা হয় কাঠ ও মন্ডের (pulp) মূল্য ও দ্রুত বৃদ্ধির নিরিখে। যার একটা হল পাইন সেগুন বা teak – যা স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ ও বাস্তুতন্ত্রের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে।

সংশোধিত অরণ্য সংরক্ষণ আইনের কেন্দ্রীয় বিন্দু হল ক্ষতিপূরণমূলক অরণ্যসৃজন। অরণ্য বিহীন জমিতে গাছ পুঁতে অরণ্যভূমির ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ করা এবং অরণ্যভূমিকে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা। এই নতুন আইনে অরণ্যের সংজ্ঞা অতি সীমাবদ্ধ। আগে বনভূমিতে যে কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ছিল এখন তাতেও ছাড় দেওয়া হয়েছে।। 'সবকিছুই' করা যাবে এই 'ক্ষতিপূরণের' বিনিময়ে। ক্ষতিপূরণমূলক অরণ্যসৃজন পরিবেশগত অবক্ষয়কে একটা পণ্যে পরিণত করেছে। নতুন আইনে প্রাথমিক 'নীতিগত' অনুমোদন নিয়েই অরণ্যে 'কাজ' শুরু করে দেওয়া যাবে। এবং কার্যোদ্ধার হয়ে গেলে অনুমতি 'কী' পদ্ধতিতে পাওয়া যায় সেটা সকলেই জানে! খনি ও শিল্প প্রকল্পে পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য যে ক্ষতিপূরণমূলক অরণ্যসৃজন দেখানো হয় তা বহু ক্ষেত্রে অস্তিত্বহীন। ভূতুড়ে বৃক্ষরোপণের জঘন্যতম উদাহরণ হল নির্দিষ্ট এলাকা। আবার এটাও স্মরণে রাখতে হবে যা কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ তার মালিকানা সরকার ধারণ করে।

বিশ্বের অরণ্যসম্পদের উপর নজরদারি করে 'গ্লোবাল ফরেস্ট ওয়াচ'। তাদের সাম্প্রতিক রিপোর্ট জানিয়েছে ২০২০ থেকে এ পর্যন্ত ভারতে ২৩ লক্ষ হেক্টর বৃক্ষ আচ্ছাদন খোয়া গিয়েছে। ২০০১ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত হ্রাস পাওয়া আচ্ছাদনের ৬০% ই হল উত্তরপূর্ব ভারতের পাঁচটি রাজ্যে। অসম, মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড ও অরুণাচল প্রদেশ। কেবল অসমেই কমেছে তিন লক্ষ চব্বিশ হাজার হেক্টর। ভারতে আছে অরণ্য সংরক্ষণ আইন। পরিবেশ সুরক্ষা আইন, বায়ুদূষণ রোধ ও নিয়ন্ত্রণ আইন ইত্যাদি। আছে জাতীয় পরিবেশ আদালত। সুতরাং যার মালিকানা তিনি তার 'সম্পত্তি' কেটে কুটে ব্যবস্থাপত্র করে দিচ্ছেন!

বাস্তবতা হল অরণ্যলোপ করে দেওয়া আর অরণ্যসৃজন করা দুটোর উদ্দেশ্যই এক। মুনাফা কামানো। জনগণের জন্য রয়েছে সুভাষিতাবলী – 'তোমার হাতে রয়েছে ভূবনের ভার। গাছ লাগাও, পরিবেশ বাঁচাও।' নিধিরাম সর্দার জনগণ গাছের চারা হাতে দৌড়াদৌড়ি করবেন 'একটি গাছ একটি প্রাণ'। দন্ডমুন্ডের কর্তা পুঁজির মালিকপক্ষ অরণ্য উজার করে দেবেন আর নতুন করে উজার করে দেওয়ার জন্য অরণ্যসৃজন করবেন!

খবরদার! বিজ্ঞানকর্মীরা ও দিকে তাকাবেন না। ওটা রাজনীতি!

রাষ্ট্র এবং বৃহৎ মালিকগোষ্ঠী দ্বারা বৃক্ষরোপণ ও বনসৃজনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি?

মানব সমাজের সঙ্গে বৃক্ষ ও অরণ্যের সম্পর্ক প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে। হোমো সেপিয়েন্স তার জন্মলগ্নের পর প্রায় ২ লক্ষ বছরের অধিকাল অরণ্যে বসবাস করেছে এবং বর্তমানেও

মানবজাতির একটা অংশ বন্য পরিবেশে বসবাস করে। সভ্যযুগের সূচনার পর মানুষ ঘর বানিয়ে বসবাস করেছে কিন্তু বৃক্ষ-গুল্ম তথা উদ্ভিদরাজি ছিল তার জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রতো সম্পর্কিত। আধুনিক গ্রামগুলির দিকে তাকালে দেখা যায় যে গ্রাম মানেই গাছপালায় ঘেরা মানব বসতি। শহরের বাসিন্দারাও একচিলতে জমি পেলে গাছ লাগায়, না পেলে টবে গাছ লাগিয়ে সাধ মেটায়। এখন বৃক্ষরোপণ নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং দেশী-বিদেশী বৃহৎ পুঁজির প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য জানা যাক। গাছ তো লাগানো হল – এর ফল ভোগ করে কে বা কারা?

পরিবেশ রক্ষার নামে বৃক্ষরোপণ এবং বনসৃজনের স্বরূপ

এখন আসা যাক পরিবেশ রক্ষার নামে বৃক্ষরোপণ বা বনসৃজনের স্বরূপ প্রসঙ্গে। সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রের এখন মুখ্য কর্মসূচি হল বৃক্ষরোপণ এবং বনসৃজন। প্রতিবছরই কনফারেন্স অফ পার্টিজ (কপ) সম্মেলনে সবুজায়ন নিয়ে বিস্তৃত বৈঠক হয়। 'জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের বিপদ' ঠেকাতে কার্বন বাণিজ্যের চুক্তি হয়। প্রতিটি রাষ্ট্রই অরণ্য সম্প্রসারণের জন্য পৃথক প্রকল্প গ্রহণ করে সংকল্প নেয়। যেমন সম্প্রতি (১৬ই জুলাই ২০২১) ভারত সরকার 'বৃক্ষরোপণ অভিযান' কর্মসূচি গ্রহণ করে দেশের মোট আয়তনের ৩৩ শতাংশকে অরণ্যের আনার সংকল্প ঘোষণা করেছে। আওয়াজ রাখা হয়েছে দেশের প্রতিটি ছাত্র একটি করে গাছ লাগাবে। রাষ্ট্র গাছের চারা সরবরাহ করে। বলা হচ্ছে সমগ্র বিশ্বে বর্তমানের তুলনায় আরও ৯০ কোটি হেক্টর (ভারতের আয়তনের প্রায় তিনগুণ) জমিতে বৃক্ষরোপণ করা হবে।

ভারতের 'পরিবেশ অরণ্য এবং জলবায়ু পরিবর্তন' মন্ত্রক রাজ্যগুলিকে ২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষে ৮৯০.০৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে,, এই বরাদ্দ ২০২১-২২ আর্থিক বর্ষে ছিল ৭৪৬৭.৪৯ কোটি টাকা।

২০২৪ এর জানুয়ারিতে ভারত হেভি ইলেক্ট্রিক্যালস (ভেল) এবং রমাপ্রসাদ গোয়েঙ্কা গোষ্ঠী প্রত্যেকে একটি গাছ লাগাবে (1t.org) প্রকল্পে প্রধান অংশীদার হয়েছে। আর পি জি গোষ্ঠী দেশের মহারাষ্ট্র, গুজরাত, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও রাজস্থানে এই প্রকল্পের জন্য গাছ লাগানোর সংকল্প ঘোষণা করেছে।

দেশের প্রতিটি রাজ্যের প্রতিটি শহর, গ্রাম, অরণ্যে সবুজায়নে দেশের ও বিদেশের হাজার হাজার কোম্পানি সবুজায়নে বিনিয়োগ করছে। ২০২১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে ১৫তম ফিনান্স কমিশন এই বনসৃজন প্রকল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধির স্বার্থে আগামী ৫ বছরের জন্য যুক্ত কোম্পানিগুলিকে ৪,২২,৪৭৬ কোটি টাকা (৫৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) কর ছাড় ঘোষণা করেছে। ফলে তারপর থেকে বিনিয়োগের পরিমাণ পুর্বের তুলনায় বহুগুণ বেড়েছে। এই সবুজায়ন প্রকল্পে অসংখ্য টিম্বার সংস্থা, ওষুধ প্রস্তুতকারি সংস্থা, প্লাইউড তৈরির কোম্পানি, বিভিন্ন ব্যাঙ্ক যুক্ত। অরণ্যে পাখি বাঁচাও, জীবজন্তু বাঁচাও, অক্সিজেন ভান্ডার গড়ো ইত্যাদি স্লোগান সামনে রেখে বনসৃজন চলছে।

অরণ্যের চন্দনকাঠ, মেহনগনি, শাল, সেগুন, মরিঙ্গা, রেড ম্যাপল, পাইন ইত্যাদি এবং ওষুধি গাছ থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার মুনাফা হচ্ছে। অথচ অরণ্যেবাসী মানুষ জঙ্গলে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে গেলে তাদের গুলি করে মারা হচ্ছে অথবা জেল হাজতে পোরা হচ্ছে, শুধুমাত্র জঙ্গলের কাঠ বা অন্য সামগ্রি থেকে মুনাফা নয়, বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণের নামে শুরু হওয়া কার্বন বাণিজ্য বিশ্ব অর্থনীতির একটি বড় এবং নতুন ক্ষেত্র। গ্লোবাল মার্কেট ইনসাইটের মতে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র বিশ্বে কার্বন ক্রেডিট মার্কেটের আর্থিক মূল্য ছিল ১০৩৮ কোটি মার্কিন ডলার এবং এই মার্কেটের বৃদ্ধির সূচক থেকে বোঝা যায় যে ২০২৪-৩২ সময়কালে সংযুক্ত বার্ষিক বৃদ্ধির হার হতে চলেছে ১৪.৮ শতাংশ হারে।

সবশেষে আউটলুক বিজনেজ পত্রিকায় ২৭শে মার্চ ২০২৪-এ প্রকাশিত "মানি প্লান্ট ঃ দ্য বিজনেস অফ ট্রি প্লানটেশন শীর্ষক রচনায় বলা হয় – "জানুয়ারি ২০২০-তে প্রকাশিত 'প্রকৃতির ঝুঁকি বাড়ছে ঃ কেন প্রকৃতি গ্রাস করা সংকট ব্যবসা এবং অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ' শীর্ষক বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম এবং প্রাইস ওয়াটারকুপারস একটি যৌথ সমীক্ষার রির্পোটে এই উপসংহারে পৌঁছেছে যে ৪৪ ট্রিলিয়ন ডলার (১ ট্রিলিয়ন = ১০০০ বিলিয়ন) এর সৃষ্ট অর্থনৈতিক মূল্য যা বিশ্বের মোট জিডিপি'র অর্ধেকেরও বেশি – প্রকৃতি এবং তার সেবাসমূহের উপর হয় মাঝারি মাত্রায় নয় তো অত্যধিক নির্ভরশীল। ফলে প্রকৃতির ধ্বংসজনিত অভিঘাতের ওপর এসে পড়ার বুঁকি রয়েছে। **"এসব কিছুর অর্থ হল বনজ সম্পদের একটি বাজার রয়েছে।"** (জোর সংযোজিত)

পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনের মাত্রা

গত সংখ্যায় আমরা লিখেছিলাম, কলোরাডো স্টেট ইউনিভার্সিটির আবহবিজ্ঞানের অধ্যাপক স্কট ড্যানিং তাঁর গবেষণাপত্রে লিখেছেন **"যদি পৃথিবীর সমস্ত জৈববস্তু একই সাথে পুড়িয়ে দেওয়া হয় তবে মাত্র ১ শতাংশ অক্সিজেন খরচ হবে ... বহু মিলিয়ন বছর টিকে থাকার মত যথেষ্ট অক্সিজেন বাতাসে রয়েছে। এবং এই পরিমাণটা নির্ধারিত হয় ভূমির**

ব্যবহার দ্বারা নয় ভূতত্ত্ব (geology) দ্বারা।"

পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার, অরণ্য নিধন, শিল্প উৎপাদন ইত্যাদি মনুষ্যজনিত কার্যকলাপের ফলে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা বৃদ্ধি এবং অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাওয়া নিয়ে বহুল প্রচারের সত্যতা বুঝতে আমাদের বিষয়টির একটু গভীরে যাওয়া প্রয়োজন। এর জন্য প্রথমে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনের সৃষ্টি ও তার বিবর্তনের ইতিহাস এবং এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনের আগমণ এবং গ্রেট অক্সিডেশন ইভেন্ট

বর্তমান পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে অধিকাংশ প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের বেঁচে থাকার অন্যতম প্রধান শর্ত অক্সিজেন। পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে বর্তমান সময়কালের মধ্যে অর্ধেকের বেশি সময়কালে বায়ুমন্ডলে অক্সিজেন অনুপস্থিত ছিল। পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে আনুমাণিক ৪৫৬-৪৬০ কোটি বছর আগে। আর পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে মুক্ত অক্সিজেনের সূচনা হয়েছে আনুমাণিক (আজ থেকে) ২৭০ কোটি বছর আগে। এর আগেও সূর্যালোকের দ্বারা ফটোলাইসিস বিক্রিয়ায় জলীয় বাষ্পের অণু হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন পরমাণুতে বিভক্ত হলেও সেই অক্সিজেন দ্রুত বায়ুমন্ডলের মিথেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ভূত্বকের অঙ্গীভূত হয়ে যেত। প্রখ্যাত বায়োকেমিস্ট লেসলি ওরজেল এর মতে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের সৃষ্টি হয় আজ থেকে আনুমাণিক ৩৮০ কোটি বছর আগে। তখন পরিবেশ ছিল অবাত শ্বসনের উপযোগী (anaerobic)। সেই সময় এক বিশেষ ধরনের অণুজীব সায়ানোব্যাকটেরিয়া'র উৎপত্তি ঘটে যারা সালোক-সংশ্লেষ করতে সক্ষম ছিল। এই সায়ানোব্যাক্টেরিয়া (নীলাভ সবজু শৈবাল নামে খ্যাত) সূর্যালোক থেকে শক্তি গ্রহণ করে জলের অণুর জারণ ঘটিয়ে অক্সিজেনের জন্ম দিতে সক্ষম হয়। প্রথমে সমুদ্রের অভ্যন্তরে সৃষ্ট অক্সিজেনের অণু জলে উপস্থিত অন্য অণুর সঙ্গে বিক্রিয়ায় নানা খনিজের জন্ম দেয়। আনুমাণিক ২০-৩০ কোটি বছর এই প্রক্রিয়া চলার পর সায়ানোব্যাক্টেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট অক্সিজেন অণুর সৃষ্টি অক্সিজেনের অন্য পদার্থে রূপান্তরের হারের তুলনায় অনেক বেশি হতে থাকে। এরপর সমুদ্রে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পাশাপাশি বায়ুমন্ডলে মুক্ত অক্সিজেন পাওয়া যায়। প্রথম দিকে বায়ুমন্ডলের মিথেন গ্যাস এর সঙ্গে বিক্রিয়ায় তা অন্য যৌগ গঠন করে। ধীরে ধীরে সমুদ্র থেকে বায়ুমন্ডলে নির্গত অক্সিজেনের মাত্রা অনেক বেশি হওয়ার ফলে অক্সিজেন বায়ুমন্ডলের মিথেনকে সরিয়ে নিজের জায়গা করে নেয়। এইভাবে আজ থেকে ২৪০-২১০ কোটি বছর আগে (এর মধ্যবর্তী সময়কালে) অক্সিজেন বায়ুমন্ডলে একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হয়ে ওঠে। এই ঘটনাকে বিজ্ঞানের ভাষায় **'Great Oxidation Event'** বা **অক্সিজেনের মহা উত্থানের ঘটনা** বলা হয়।

এই ঘটনা পৃথিবীর পরিবেশের উপর এক বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করে। মিথেন যেহেতু একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রীণহাউস গ্যাস, তার মাত্রা বায়ুমন্ডলে কমে যাওয়া এবং সূর্যকে পৃথিবী দ্বারা পরিক্রমণের ব্যাসার্ধের পরিবর্তন, অগ্নুৎপাত এবং মহাদেশীয় সঞ্চরণের যৌথ কারণে সমগ্র পৃথিবী বরফে আবৃত হয়ে পৃথিবীতে প্রথম বরফযুগের আগমণ ঘটায়। একে হিউরোনিয়ান বরফ যুগ (আজ থেকে ২৪০-২১০ কোটি বছর আগে) বলা হয়। ধীরে ধীরে বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনের মাত্রা বৃদ্ধি পৃথিবীতে তৎকালীন সময়ে উপস্থিত জীবকূলের জন্য মারাত্মক বলে প্রমাণিত হয়। বহু প্রজাতির গণবিলুপ্তি ঘটে। এই সায়ানোব্যাকটেরিয়া (নীলাভ সবুজ শৈবাল) আজও টিকে আছে এবং বায়ুমন্ডল ও সমুদ্রে অক্সিজেন উৎপন্নকারী প্রোক্যারিওটিক জীব হিসেবে অত্যন্ত উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

বিজ্ঞানী সি এ লি, এল ওয়াই ইয়াং, আর এন ম্যাকাঞ্জি প্রমুখ দ্বারা নেচার জিওসায়েন্স পত্রিকায় (১৬/০৫/২০১৬) প্রকাশিত গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে যে বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনের মাত্রার বিরাট আকারে বৃদ্ধি ঘটেছে প্রোটেরোজোয়িক যুগের হিউরোনিয়ান যুগের (আজ থেকে ২৪০-২১০ কোটি বছর) আগে। **আজ থেকে প্রায় ২৭০-২৫০ কোটি বছর আগে পৃথিবী পৃষ্ঠে প্লেট টেকটনিক্স এর সূচনা হয় ভূত্বক কঠিন ও শীতল হওয়ার পর। বিজ্ঞানীদের অনুমান এটাই পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনের মাত্রা বৃদ্ধির প্রধান কারণ।** এই সময়কার ভূআলোড়নের ফলে প্রথমে ভূত্বকের রাসায়নিক গঠন লৌহ-ম্যাঙ্গানিজ সমৃদ্ধ ম্যাফিক প্রস্তরের আংশিক গলন (partial melting) এর ফলে অ্যালুমিনিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম সমৃদ্ধ ফেলসিক প্রস্তরের সৃষ্টি হয়। ভূত্বকের রাসায়নিক গঠনের এই পরিবর্তন ভূত্বকের জারণ দক্ষতা (oxidative efficiency) কমিয়ে দেয়, ফলে বায়ুমন্ডলে মুক্ত অক্সিজেন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরপর প্রায় ১০০ কোটি বছর এই প্রক্রিয়া চলার পর আনুমাণিক (আজ থেকে) ১৭০-১৫০ কোটি বছর আগে মহাদেশে ধীরে ধীরে (জৈব বৈচিত্রের কারণে) কার্বন জমা হতে থাকে। শিলার রূপান্তর প্রক্রিয়া (metanorphism) এবং মাটির নিচের গলিত ম্যাগমার সঙ্গে বিক্রিয়ায় এবং মহাদেশীয় কার্বন সমুদ্র ও বায়ুমন্ডলের পরিবেশে দীর্ঘস্থায়ীরূপে কার্বন ডাই অক্সাইডের

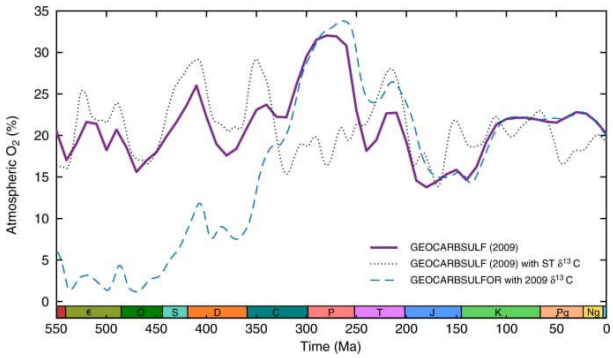

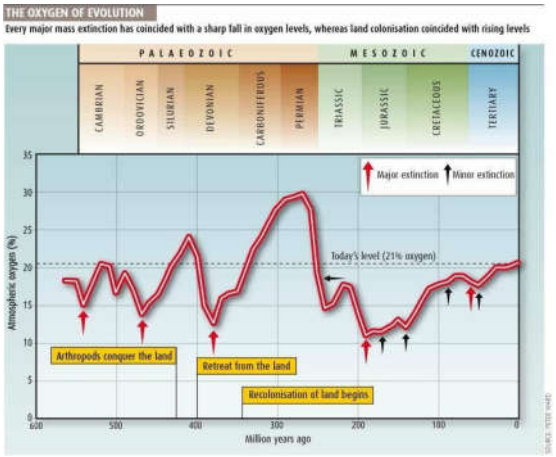

মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে। সমুদ্র ও বায়ুমন্ডলের পরিবেশে এই কার্বন ডাই অক্সাইডের যোগান বায়ুমন্ডলে দ্বিতীয়বারের জন্য প্রবলহারে অক্সিজেনের মাত্রা বৃদ্ধি করেছে।

এছাড়া সমুদ্রের বিস্তার (Sea Floor Spreading) এবং মহাদেশীয় ও সামুদ্রিক শিলার আবহবিকার (weathering) এর মাত্রার হ্রাসবৃদ্ধি বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনের মাত্রার হেরফেরের জন্য বড় ভূতাত্ত্বিক কারণ।

এবার আসা যাক পৃথিবীর ইতিহাসে পরবর্তী যুগে বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনের মাত্রার বারংবার পরিবর্তনের ইতিহাসে। প্যালিওজোয়িক যুগ (অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ৫৭ কোটি বছর) আগে থেকে বর্তমান সময়কালের সুদীর্ঘ ইতিহাসে বার বার পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনের মাত্রার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটছে। পারমিয়ান যুগে (অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ২৮ কোটি বছর আগে) পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনের মাত্রা বেড়ে হয়েছিল প্রায় ৩০ শতাংশ। ক্যামব্রিয়ান যুগে (অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ৫৪-৫২ কোটি বছর আগে) পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনের মাত্রা বর্তমান কালের (বায়ুমন্ডলের প্রায় ২১ শতাংশ) সমান ছিল। (চিত্র ঃ The Oxygen of Evolution, New Scientist Journal)।

এই লেখচিত্র দুটি প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনের মাত্রা প্রশ্নে পরিবেশবাদীদের ভ্রান্ত ও অবৈজ্ঞানিক প্রচারটি খন্ডন করতে যথেষ্ট। এই লেখচিত্রে জীবকূলের বড় ও ছোট গণবিলুপ্তির সাথে অক্সিজেনের মাত্রার সম্পর্কও বিবৃত করা হয়েছে। প্রাচীনকালে পৃথিবীতে মানুষের উৎপত্তির অনেক আগে, পৃথিবীর বুকে ঘন জঙ্গল সৃষ্টির আগে ও পরে বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনের মাত্রার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটেছে বিপুল হারে। জুরাসিক যুগে ঘনজঙ্গলে আবৃত পৃথিবীতে (আজ থেকে প্রায় ২১ কোটি বছর আগে) বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনের মাত্রা ছিল সর্বানিম্ন (প্রায় ১১ শতাংশ) এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা ৬০০০ প্রতি ১০ লক্ষে (বর্তমানে প্রতি ১০ লক্ষে ৪২১)।

সকল তথ্যই অধ্যাপক স্কট ড্যানিং এর মতামতের সত্যতাই প্রমাণ করে – **বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনের মাত্রা নির্ভর করে ভূমির ব্যবহার দ্বারা নয় ভূতত্ত্ব দ্বারা**। সুতরাং বনসৃজন বা বৃক্ষরোপণই জলবায়ু সমস্যার একমাত্র সর্বরোগহর দাওয়াই একথা বলা বিজ্ঞানসম্মত নয়। ■

●*সম্পাদকীয় শেষাংশ ... মুনাফার স্বার্থে প্রকৃতি ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র*

রয়েছে মুনাফা গড়ে তোলার উদ্দেশ্য।

এই সত্য প্রত্যেক দেশের সরকার, সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তি ও বিজ্ঞানী-বুদ্ধিজীবীদের কাছে থাকা সত্ত্বেও, সাধারণ মানুষের কাছে তারা এটা গোপন করে। কারণ ব্যাপক সাধারণ শ্রমজীবী জনগণকে শিক্ষা-স্বাস্থ্য-রোজগার থেকে বঞ্চিত রেখে ও নরক সদৃশ পরিবেশ টিকিয়ে রেখেই এই ব্যবস্থার মালিক-বৃহৎ পুঁজিপতিশ্রেণী মুনাফার পাহাড়ে বসে আছে। পরিবেশ দূষণের সমস্ত দায় সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়েই এই অসাম্যের পরিবেশটাকে তারা টিকিয়ে রাখতে চায়। এছাড়া প্রকৃতিকে মুনাফার স্বার্থে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। তাই যে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ প্রকৃতিকে সভ্যতার উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছে, তাকে দায়ী করার প্রতিটি পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হতে হবে। মানুষের মতো বেঁচে থাকার সুস্থ পরিবেশ তৈরী করতে এর বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই মুনাফার স্বার্থে প্রকৃতির ধ্বংস রোধ করা সম্ভব হবে। ■

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী ঃ

ব্যতিক্রমী বিজ্ঞানী পিটার হিগস প্রয়াত

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সাব অ্যাটমিক (একটি পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ অতিক্ষুদ্র) কণা কীভাবে ভরের জোগান দেয় সেই নিয়ম আবিষ্কারক, আধুনিক যুগের কিংবদন্তী বিজ্ঞানী পিটার ওয়ার হিগস গত ৮ই এপ্রিল ২০২৪ প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর এই আবিষ্কার মহাবিশ্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের দেওয়া পার্টিকেল ফিজিক্সের স্ট্যান্ডার্ড মডেলকে পূর্ণতা দিতে এক অবিস্মরণীয় কাজ হিসেবে মানা হয়। ২০১২-১৩ খ্রিস্টাব্দে পরীক্ষাগারে (লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার) তাঁর তত্ত্ব বার বার প্রমাণিত হওয়ার পর তাকে ২০২১৩ খ্রিস্টাব্দে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। যদিও নোবেল পুরস্কার পাওয়ার আগেই বিবিসি-র তথ্যচিত্রে পিটার হিগসকে 'পার্টিকেল ম্যান' হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। কণা পদার্থ বিজ্ঞানে ভরের যোগানদায়ী বোসন (বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের নামাঙ্কিত) কণা হিসাবে তাঁর আবিস্কৃত কণাকে তাঁর নামে **হিগস বোসন কণা** বলা হয়।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে মে তিনি সংযুক্ত রাজ্যের নিউক্যাসেল-এ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা থমাস হিগস ছিলেন বিবিসি-র একজন সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার। জন্মের পরই তিনি মা-বাবার সঙ্গে বার্মিংহামে চলে যান এবং শৈশব ও কৈশোরের সূচনাকাল সেখানেই অতিবাহিত হয়। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধ তীব্র হওয়ায় বিবিসি সিদ্ধান্ত নেয় যে বার্মিংহাম বিপজ্জনক হয়ে পড়ছে তাই সংবাদ প্রচার কেন্দ্রকে ব্রিস্টলে স্থানান্তর করা হবে। বোমার আঘাত থেকে বাঁচতে হিগস পরিবার সেই সময় ব্রিস্টলে চলে আসে এবং এক সপ্তাহের মধ্যে ব্রিস্টলে বিরাট আকারে বোমা পড়ে।

ব্রিস্টলে হিগস কোথাম গ্রামার স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুলের প্রাক্তন বিখ্যাত ছাত্রদের তালিকায় ছিল নোবেল জয়ী বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী পল ডিরাকের নাম। ছেলেবেলা থেকেই পিটার তাঁর অনুগামী হয়ে পড়েন। পিটারের বাবার ছিল অঙ্কের বইয়ের বিরাট সংগ্রহ। এই কারণে বাবার অনুপ্রেরণায় অল্প বয়স থেকেই পিটার অঙ্ক এবং রসায়ন ভালোবাসত। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধের শেষে একটি বিশেষ ঘটনা পিটারকে পদার্থবিজ্ঞানে আকৃষ্ট করে তোলে। ব্রিস্টলের পদার্থবিদ্যায় নোবেল জয়ী দুই

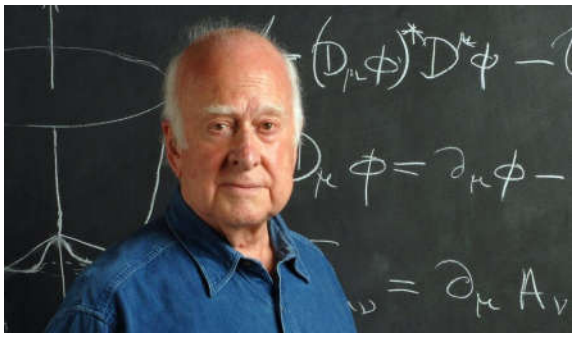

বিজ্ঞানী সেসিল পাওয়েল এবং নেভিল মট কিছু পাবলিক লেকচারে ছাত্রদের পরমাণু বোমা সৃষ্টির প্রেক্ষাপট নিয়ে ক্লাস নিচ্ছিলেন। এই ক্লাসের পর পিটারের অঙ্কের বদলে পদার্থবিজ্ঞানে আকর্ষণ বেড়ে যায় এবং পদার্থবিজ্ঞানই তাঁর কর্মজীবন হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে পিটার পরমাণু অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণ সংগঠনের একজন সদস্য হন।

লন্ডনের কিং কলেজে তিনি তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে অধ্যয়ন করেন এবং ওখান থেকেই ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর কাজের মূল প্রতিপাদ্য ছিল আণবিক পদার্থবিদ্যা। আণবিক গঠনের প্রতিসাম্য (Symmetry)র ধারণা ছিল মুখ্য বিষয়। এই থেকেই তিনি একজন কণা পদার্থবিদ হয়ে ওঠেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ঘরে বসতেন সেই করিডোরেই বসতেন ডিএনএ গঠনের মূল আবিষ্কারক, উপেক্ষিত বিজ্ঞানী রোসালিন্ড ফ্রাঙ্কলিন এবং মুরি উইলকিনস্। যদিও তাঁদের কাজের সঙ্গে তাঁর কাজের কোন মিল সরাসরি পাওয়া যাবে না।

এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৫৪-৫৬), লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৬-৫৭), ইমপেরিয়াল কলেজ (১৯৫৭-৫৮) এ গবেষণার পর তিনি ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে পাকাপাকিভাবে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং বাকি কর্মজীবন সেখানেই কাটান।

আজকের দুনিয়ার যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষক/বিশ্ববাসীদের কাছে রাষ্ট্র তথা নিয়োগকর্তার প্রত্যাশা একটাই থাকে। তা হল গবেষক বা বিজ্ঞানীরা

পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে একের পর এক গবেষণাপত্র লিখে চলবেন এবং সেগুলি নামী-দামি দেশী-বিদেশী জার্নালে ছাপানো হবে। পণ্যের বা প্রযুক্তির মান উন্নয়ন, যুদ্ধাস্ত্র, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ফান্ডিং হয় সর্বাধিক, প্রকৃতির রহস্যসৃষ্টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় সবচেয়ে কম। এই নিরন্তর গবেষণাপত্র লিখবার এক প্রচন্ড পারিপার্শ্বিক চাপ আজকের দিনের শিক্ষাজগতের সর্বত্র, সমগ্র বিশ্বজুড়ে চলছে। এই গবেষণাপত্র কত সংখ্যায় কোন্ কোন্ নামী জার্নালে ছাপা হলো তা দিয়েই কোন গবেষক/বিজ্ঞানী-র মান নির্ণয় হয়, চাকরির স্থায়িত্ব বা পদোন্নতি নির্ভর করে। এই পরিকাঠামোতে কি অতি উচ্চমানের বা যুগান্তকারী আবিস্কার বা গবেষণা হওয়া সম্ভব? পিটার হিগস্ কিন্তু বরাবর এই প্রক্রিয়াতে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

হিগস কিন্তু তাঁর ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের যুগান্তকারী আবিষ্কারের পরে বাকি জীবনে গবেষণাপত্র লিখেছেন ১০টিরও কম। ২০২২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বই 'ইলিউসিভ ঃ হাউ পিটার হিগস সলভড দ্য মিস্ট্রি অফ মাস' পুস্তকে লেখক ফ্রাঙ্ক ক্লোজকে পিটার হিগস বলেন ঃ হিগস্ বোসনই তাঁর একমাত্র 'অরিজিনাল আইডিয়া'। একগাদা অর্থহীন গবেষণাপত্র ছাপাতে তিনি মোটেই আগ্রহী ছিলেন না।

আজকের দিনে বিশ্বের প্রায় প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট অধ্যাপকদের কাছে বছরে একবার বা দুবার তাদের সাম্প্রতিক ছাপা হওয়া গবেষণাপত্রের হিসেব চাওয়া হয়। এই সংখ্যা (এবং কত দামী জার্নালে তা প্রকাশিত)র উপর গবেষকদের চাকরির স্থায়িত্ব/পদোন্নতি নির্ভর করে। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়, হিগস্ বোসন কণা তথা ভরের যোগানের নিয়ম, যা কিনা মহাবিশ্বের সৃষ্টির রহস্য সমাধানের মত যুগান্তকারী কাজ করেছে তার আবিষ্কারকের কাছেও এই হিসেব চাইত। পিটার হিগস্ প্রচলিত সিস্টেমের প্রতি বিদ্রোহ করে জবাব দিতেন 'নান' (একটিও নয়) বলে। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে একসময় বোঝা মনে করতে শুরু করল এবং ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর চাকরি যাওয়ার কথাও ওঠে। কিন্তু ঘটনাচক্রে সে বছর তিনি নোবেল পুরস্কারে জন্য মনোনীতদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় চাকরি খোয়ানো থেকে রক্ষা পেয়ে যান।

নোবেল পুরস্কার নিতে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে স্টকহোম যাওয়ার পথে 'দ্য গার্ডিয়ান' পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হিগস্ বলেছিলেন যে শান্তি ও নিরুপদ্রব পরিবেশে তিনি ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে কাজ করে এই আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন তা আজকের দুনিয়ায় দাঁড়িয়ে কল্পনা করাও কঠিন।

আজকের দুনিয়ার উচ্চশিক্ষায় মূলমন্ত্রই হল 'পাবলিশ অর পেরিশ' অর্থাৎ নিরন্তর গবেষণাপত্র ছাপিয়ে চল অথবা ধ্বংস

হিগস্ বোসন

আপনি এবং আপনার চারপাশের সবকিছু কণার দ্বারা গঠিত। কিন্তু যখন মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছিল, তখন কোনো কণারই ভর ছিল না; তারা চারিদিকে ছড়িয়ে ছিল আলোর গতিতে গতিময় অবস্থায়। তারাগুলির এবং গ্রহগুলির সৃষ্টি এবং জীবনের আগমন একমাত্র যে কারণে হয়েছে, তা হল কণাগুলির ভরপ্রাপ্তি, তা হয়েছে হিগস্ বোসনের সাথে থাকা একটি মৌলিক ফিল্ডের জন্য। ভরের জন্ম দেয় যে ফিল্ড তা নিশ্চিতভাবে জানা গেছিল ২০১২তে, যখন সার্ন (CERN)-এ হিগস্ বোসন কণার আবিষ্কার হয়েছিল।

হিগস্ বোসন কি?

আমাদের প্রকৃতি সম্পর্কে বর্তমান বর্ণনায় প্রত্যেকটি কণাই এক একটি ফিল্ডে থাকা তরঙ্গ। এর সব থেকে পরিচিত উদাহরণ হল আলো ঃ আলো হল একই সঙ্গে একটি ইলেকট্রোম্যাগনেটিভ ফিল্ডে তরঙ্গ এবং কণার প্রবাহ, যাকে ফোটন বলা হয়।

হিগস্ বোসনের বেলায় ফিল্ডটি সবার আগে আসে। এই হিগস্ ফিল্ডের প্রথম প্রস্তাবনা আসে ১৯৬৪-তে একটি নতুন রকম ফিল্ড হিসেবে যা গোটা মহাবিশ্বে ছড়িয়ে আছে এবং সকল মৌলিক কণাকে ভর দিয়েছে। হিগস্ বোসন এমনই ফিল্ডের তরঙ্গ। এর আবিষ্কার হিগস্ ফিল্ডের অস্তিত্বকে নিশ্চিত করে।

(সার্নের অফিসিয়াল ওয়েব সাইট https://home.cern থেকে অনুদিত)

হও। ভালো মানের গবেষণা বা আবিষ্কারের ক্ষমতা যাঁদের আছে এই সিস্টেমের জাঁতাকলে পড়ে, এই ইঁদুর দৌঁড়ে ছুটতে ছুটতে তাদের পক্ষে নিঃসন্দেহে ভালো মানের গবেষণা অসম্ভব কঠিন।

২০১৬ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত বিজ্ঞান জার্নাল 'নেচার' পত্রিকা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের গবেষকদের মধ্যে একটি সমীক্ষা করে। সেই সমীক্ষায় দেখা গেছে যে আজকের দুনিয়ায় একজন গবেষক মাত্র ৩৮ শতাংশ সময় দিতে পারেন তাঁর গবেষণার কাজে। বাকি সময় ব্যয় হয় পড়ানো আর নানা প্রশাসনিক কাজকর্মে। তা সত্ত্বেও সিস্টেম হা-হুতাশ করে চলে, কেন আধুনিক আইনস্টাইন, ফেইনম্যান কিংবা মেরি ক্যুরি তৈরি হচ্ছে না এই সিস্টেমে।

এই সিস্টেমের মধ্যে তাই হিগস্ একজন বিরল ব্যতিক্রমী বিজ্ঞানী। সিস্টেমের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে চির বিদ্রোহী হয়ে তিনি চলেছেন নিজের ছন্দে, নিজের নিয়মে। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন এই সিস্টেমের অসারতাকে। হিগস ছিলেন প্রচার বিমুখ বিজ্ঞানী। মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করতেন না। ৮ই অক্টোবর ২০১৩ নোবেল পুরস্কার ঘোষণার দিন তিনি সচেতনভাবে বেলা ১১টায় বাড়ি ছেড়ে বেড়িয়ে পড়েন। সুইডিশ অ্যাকাডেমি পুরস্কার ঘোষণার সময় তাঁকে খুঁজে পায় না। সারাদিন ঘুরে, হোটেলে মধ্যাহ্নভোজন করে আর্ট গ্যালারি ভ্রমণ করে হেঁটে বাড়ি ফেরার সময় এক প্রতিবেশি ভদ্রমহিলা গাড়ি থামিয়ে তাঁকে দেখে বলেন 'আমার মেয়ে এক্ষুণি লন্ডন থেকে ফোন করে আমাকে আপনার অ্যায়োয়ার্ড (পুরস্কার) সম্পর্কে জানাল'। পিটার তখন মহিলাকে বলেন 'কিসের অ্যায়োয়ার্ড?' এমন মজা করলেও তিনি তাঁর আশঙ্কা সম্পর্কে নিশ্চিত হন বাড়িতে গিয়ে ফোনে খবর পেয়ে।

মহাবিশ্ব সৃষ্টি সম্বন্ধীয় যে সমস্ত তত্ত্ব প্রচলিত আছে তার মধ্যে বিশ্বের বিজ্ঞানীদের কাছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব হল মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব, যা বিগ ব্যাং থিওরি নামে পরিচিত। এই তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সব রকমের উপাদান বৈজ্ঞানিকদের হাতে থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজন ছিল এমন কণার অস্তিত্ব যা পদার্থকে ভরপ্রদান করে। মহাবিস্ফোরণকালে এমন কণার অস্তিত্ব গাণিতিকভাবে প্রমাণ করেছিলেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। তাই বিজ্ঞানী পল জিরাড এই কণার নাম দিয়েছিলেন বোসন কণা। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানী পিটার হিগস এই তত্ত্বকে সমৃদ্ধ করেন এবং একটি বিশেষ ধরনের বোসন কণার অস্তিত্বকে দৃঢ় গাণিতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। যাকে হিগস্ বোসন কণা বা হিগস্ কণা হিসাবে অভিহিত করা হয়। এই কণার অস্তিত্ব ১০০ শতাংশ নিশ্চিত করতে প্রয়োজন হয়ে পড়ল এক সুবিশাল গবেষণাগার এবং এক অতিক্ষমতাশালী যন্ত্রের। গত ৪ঠা জুলাই ২০১২ সার্ন অর্থাৎ পরমাণু গবেষণা বিষয়ক ইউরোপীয় সংগঠন ঘোষণা করল যে পরীক্ষাগারে একটি ৫ সিগমা স্তরের এবং মোটামুটি ১২৬ জিইভি ভরের কণা পাওয়া গেছে যা হিগস্ বোসন কণা। এরপর বার বার পরীক্ষা করে এই বিষয়ে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হন। মাটির ১৭৫ মিটার গভীরে ২৭ কি.মি পরিধি বিশিষ্ট একটি দীর্ঘ সুড়ঙ্গে প্রায় আলোর গতিসম্পন্ন প্রোটন কণার সংঘর্ষে এই কণা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। মহাবিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে ঐশ্বরিক অলৌকিক তত্ত্বের পরাজয় হয়। জয় হয় বিজ্ঞানের।

কিন্তু হিগস্ বোসন কণা ঈশ্বরীয় তত্ত্বকে নস্যাৎ করে দেবে এই আশঙ্কায় হিগস বোসন কণাকে ঈশ্বরীয় কণা বা গড পার্টিকেল নাম দেওয়া হয়। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী লিও লেডারম্যান একটি বই লেখেন 'ইফ দ্য ইউনির্ভাস ইজ দ্য আনসার, হোয়াট ইজ দ্য কোয়েশ্চন' শিরোনামে। এই বইতে প্রকাশক বাজারে বইয়ের কাটতির জন্য 'হিগস্ বোসন' কণাকে গড পার্টিকেল নামে অভিহিত করেন। ঈশ্বর তত্ত্বে চরম অবিশ্বাসী, নাস্তিক পিটার হিগস্ এর তীব্র বিরোধিতা করেন। পিটার হিগস্ বলেন **"ঐ কণাকে ঈশ্বর কণা নামে অভিহিত করার কোন কারণ নেই কারণ এই কণা হল সৃষ্টিরহস্য উদ্‌ঘাটনকারী কণা যা ঈশ্বরের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে।"**

তাই আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাসে পিটার ওয়ার হিগস একজন বিরল ব্যতিক্রমী প্রথম সারির বিজ্ঞানী। বিশ্বের বিজ্ঞান মনস্ক প্রতিটি মানুষ অলৌকিকতাবাদের বিরুদ্ধে সৃষ্টি রহস্য উন্মোচনে তাঁর ভূমিকাকে দৃঢ়চিত্তে চিরকাল স্মরণ করবে। ■

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

১) পিটার হিগস্ অবিচুয়রি, দ্য গার্ডিয়ান

২) হিগস নিজস্ব নিয়মে ব্যতিক্রমী বিজ্ঞানী – অতনু বিশ্বাস, উত্তরবঙ্গ সংবাদ ২৫/০৪/২০২৪

সাক্ষাৎকার ঃ

নোবেল প্রাইজ ফাউন্ডেশনকে দেওয়া পিটার হিগস্ এর সাক্ষাৎকার

[২০২৪ খ্রিস্টাব্দের ৮ই এপ্রিল পদার্থ বিজ্ঞানী পিটার ওয়ার হিগস প্রয়াত হন। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর নোবেল প্রাইজ ফাউন্ডেশনকে তিনি একটি সাক্ষাৎকার দেন। এই সাক্ষাৎকারে তাঁর কাজ ছাড়াও উঠে এসেছে জীবনের অজানা কিছু কথা। সাক্ষাৎকারটি পাঠকদের জন্য প্রকাশ করা হল সংক্ষিপ্তরূপে। সাক্ষাৎকারদির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত 'বিজ্ঞান চিন্তা' পত্রিকায়। বঙ্গানুবাদ করেছেন জাহিদ হোসেন খান।

– সম্পাদক, সমীক্ষণ]

প্রশ্ন ঃ যে গবেষণার জন্য আপনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, তরুণদের জন্য সহজ করে বলুন।

পিটার হিগস ঃ একটি তুষার ঢাকা মাঠের কথা কল্পনা করুন। এই মাঠটি যেন মহাবিশ্ব। মাঠটি এক একজন একেকভাবে পাড়ি দেন। কেউ স্কির স্ট্রাইপ, কেউ বা স্নো শু, কেউ আবার সাধারণ বুট জুতা পরে পার হন। যাঁরা স্কি করেন, তাঁরা কম বাধার মুখে পড়েন। দ্রুত গতিতে ঝামেলাহীনভাবে পেরিয়ে যান মাঠটি। যাঁরা স্নো শু পড়েন, তাঁরা চলাফেরায় কিছুটা বাধা পান। আর যাঁরা বুট জুতা পরেন, তাঁরা খুব ধীরে অতিক্রম করেন মাঠটি। কণাদের সঙ্গে আমরা মাঠ পেরোনোর বিষয়টি মেলাতে পারি। কিছু কণা আলোর গতিতে ভরহীন অবস্থায় ভ্রমণ করে। তারা দ্রুত ছুটতে পারে। ভারী কণার ক্ষেত্রে অন্য ঘটনা ঘটে। মাঠের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় এগুলো ছুটতে গিয়ে বাধা পায়। এই বাধাটাই আসলে ভর। আমার ধারণা, অন্য যে কোনো ব্যাখ্যার চেয়ে এতে পদার্থবিজ্ঞানের জটিলতা কম।

প্রশ্ন ঃ স্ট্যান্ডার্ড বা প্রমিত মডেল নিয়ে একটু বলুন।

পিটার হিগস্ ঃ ১৯৬৪ সালে আমাদের এক গবেষণার সূত্র ধরে ইলেকট্রোউইক থিওরি বা তড়িৎ-দুর্বল তত্ত্বের দিকে এগিয়ে যান বিজ্ঞানীরা। মৌলিক কণাদের দুর্বল ও তড়িৎচম্বুকীয় মিথস্ক্রিয়ার একীভূত রূপ এই তত্ত্ব। ১৯৬৭ সালে স্টিফেন ওয়াইবার্গ এবং আবদুস সালামের গবেষণার ফলে গড়ে ওঠে তত্ত্বটি। তত্ত্বটার একীভূতকরণ ঠিক ছিল তবে মোলডন গ্ল্যাশোর কারণে হিসাব-নিকাশ পুরোপুরি ঠিক হয়নি। তবে '৬৪ সালের ওই গবেষণায় প্রতিসাম্যের যে ভেঙে পড়ার বিষয়টি পাওয়া গিয়েছিল, এর সঙ্গে এই মডেলটি খাপ খেয়ে যায়। ওটাই ছিল স্ট্যান্ডার্ড মডেল বা প্রমিত মডেলের সূচনা।

পরে জানা গেল, তত্ত্বটা গাণিতিকভাবে ঠিক আছে, এটা দিয়ে (কণাদের আচরণ ও বিভিন্ন মিথস্ক্রিয়া) ঠিকভাবে গণনা করা যায়, তখন অনেকে কণাপদার্থবিজ্ঞানের অন্যান্য বলের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব দিয়ে গবেষণা করতে শুরু করেন। এভাবে শক্তিশালী নিউক্লিয়ার বলের একটি তত্ত্ব পাওয়া যায়। এর নাম ক্রোমোডাইনামিকস (কিউসিডি)। অর্থাৎ ১৯৬৪ সালের কাজটিই ছিল কণা পদার্থবিজ্ঞানে কোয়ান্টাম ফিল্ড তত্ত্বের ফিরে আসার শুরু। আগে ৫০-এর দশকে কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডাইনামিকস সফল হলেও, পরে দেখা গেল, কিছু কণার ক্ষেত্রে ঠিকভাবে কাজ করছিল না। তখন কিছুদিন এটাকে উপেক্ষা করা হয়। এটা যেন কাজ করে, আমরা সে পদক্ষেপের সূচনাটুকু করেছিলাম।

প্রশ্ন ঃ কখন বুঝলেন আপনার কাজটি যুগান্তকারী?

পিটার হিগস্ ঃ তেমন কোন নির্দিষ্ট মুহূর্ত ছিল না ওটা। আমি কণাপদার্থবিদ্যার একটি উপপাদ্য এড়াতে চেষ্টা করার সময় ব্যাপারটা প্রথম উপলব্ধি করি। কণা পদার্থবিদ্যায় একধরণের প্রতিসাম্য ভাঙন ইঙ্গিত করে যে কোনো একধরনের স্পিনহীন ও ভরহীন কণার অস্তিত্ব আছে। উপপাদ্যটি ছিল এই বিষয়ক। উপপাদ্যটি এ তত্ত্বকে অগ্রহণযোগ্য করে তোলে। কারণ তখন পর্যন্ত এ ধরনের কণার অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি। যে তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে এসব ধারণা তৈরি হয়, এর চার বছর আগে ইয়োচিরো নাম্বু তা প্রণয়ন করেন। জেফ্রি গোল্ডস্টোনের সঙ্গে যুগ্মভাবে কাজ করেছিলেন তিনি। ইয়োচিরো নাম্বু ২০০৮ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। আমি বুঝতে পারলাম, এ উপপাদ্যে ত্রুটি আছে। যেমন কোয়ান্টাম ইলেক্ট্রোডাইনামিকসে ম্যাক্সওয়েলের ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড বা তড়িৎ চুম্বকীয়

তত্ত্বের জন্য প্রয়োজনীয় গাণিতিক সত্যতা নিশ্চিত হয় না।

কোয়ান্টাম ইলেক্ট্রোডাইনামিকস তত্ত্বটি প্রতিসাম্য ভাঙনের এই ঘটনার ব্যাখ্যা করে না। কিন্তু স্পষ্ট দেখা যায়, এ ধরনের ক্ষেত্র রয়েছে, যেগুলো এসব উপপাদ্য বা সংশ্লিষ্ট স্বতঃসিদ্ধ মেনে চলে না। তখন এ ধরনের ক্ষেত্র প্রবর্তনের পথ তৈরি করে। নাম্বুর বলা প্রতিসাম্য ভাঙার বিষয়টি খাপ খেয়ে যায়। সপ্তাহান্তে এক ছুটির দিনে আমি ধীরে ধীরে বুঝতে পারি, আমি দুটি জিনিস জানি। এদের এক করতে হবে। কিছুদিন আগেই আমি জুলিয়াস শ্রোডিঙ্গার একটি গবেষণাপত্র পড়েছিলাম। ভদ্রলোক কোয়ান্টাম ইলেক্ট্রোডাইনামিকসের জন্য নোবেল পুরস্কার জয়ীদের একজন। যতটুকু মনে পড়ে, তিনি ১৯৬৫ সালে এ পুরস্কার পান। তাঁর তত্ত্বের ধরণটা ছিল একটু আলাদা। এতে এমন কিছু সমীকরণ তৈরি হয়, যেগুলো আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের নিয়ম লঙ্ঘন করে। তবে এতে পদার্থবিজ্ঞানের [মূল বিষয়গুলো] প্রভাবিত হয় না। প্রচলিত ধারার গণিতের উদ্ভট একধরনের রূপ ছিল ওদের এ কাজ। জুলিয়াসের এই গবেষণাপত্র পড়েই আমি বুঝতে পারি, কী করা উচিত। তবে এটা হুট করে হয়ে যায় নি। তখন সপ্তাহান্তের ছুটি। আমাকে তাই সোমবার অফিসে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হলো যে আমি আসলে ভুল কিছু করিনি।

প্রশ্ন ঃ আপনার আদর্শ (রোল মডেল) কে?

পিটার হিগস্ ঃ হাইস্কুলে পদার্থবিজ্ঞানে আমার তেমন আগ্রহ ছিল না। গণিত ও রসায়নে ভালো ছিলাম। বিশেষ করে রসায়নের নানা বিষয় নিয়ে বেশ উৎসাহী ছিলাম আমি। পদার্থের আণবিক গঠনে বিভিন্ন স্তরের কথা জেনেছিলাম। ধীরে ধীরে জানতে পারি, পদার্থের আরও গভীর স্তর রয়েছে। জানতে পারলাম, যে সব পদার্থবিজ্ঞানে আলোচনা হয়। তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে আকর্ষণীয় কিছু জিনিস খুঁজে পেলাম তখন। আমাকে প্রভাবিত করলেন **পল ডিরাক**। প্রায় এক শতাব্দী আগে উনি আমার স্কুলে পড়তেন। ১৯২০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে কোয়ান্টাম মেকানিকসের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তাঁর সম্পর্কে আমি কৌতূহলী ছিলাম। প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের কথা উঠে এলেই বার বার তার নাম ঘুরে ফিরে আসত। এই কৌতূলহল থেকেই আমি পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞান (অ্যাটমিক ফিজিক্স) ও কোয়ান্টাম তত্ত্ব সম্পর্কে পড়তে শুরু করি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে, জাপানে বোমা ফেলার কিছুকাল পরেই আমার হাইস্কুল অধ্যায় শেষ হয়। তখন ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের দুই অধ্যাপক কিছু পাবলিক লেকচারের আয়োজন করেন। একজন ছিলেন তাত্ত্বিক, আরেকজন ছিলেন পরীক্ষণবিদ বা এক্সপেরিমেন্টালিস্ট। আমি তখন কিছু লেকচার শুনতে গিয়েছিলাম। যুদ্ধের বোমা তৈরির প্রেক্ষাপট কী ছিল, তা জনসাধারণকে জানানোর জন্য এসব বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। দারুণ সফল বক্তৃতা সিরিজ ছিল সেটা। পরীক্ষণ পদার্থবিদের নাম ছিল সিসিল পাওয়েল। তিনি এক্সপেরিমেন্টাল কণাপদার্থবিজ্ঞানে কাজ করতেন। সেই সময়ে এ ধরনের পরীক্ষার জন্য বেলুনের সাহায্যে বায়ুমন্ডলের ওপরের স্তরে ফটোগ্রাফিক ইমালশনের প্যাকেজ পাঠানো হতো। তিনি তাঁর নিজের কাজ সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। আমি তাঁর কাছ থেকে কণাপদার্থবিজ্ঞানের পরীক্ষণ সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছি। তাঁর লেকচার আমাকে বুঝতে সাহায্য করেছিল যে আমি কী করতে চাই।

প্রশ্ন ঃ নোবেল পুরস্কার পাওয়ার সময় কী করেছিলেন?

পিটার হিগস্ ঃ যখন পুরস্কার ঘোষণা করা হয়, তখন আমি বাড়িতে ছিলাম না। ইচ্ছা করেই বাইরে ছিলাম। নোবেল ফাউন্ডেশন বা একাডেমির কাউকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছিলাম না। তবে গণমাধ্যমের দৃষ্টি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছিলাম। আমার ধারণা ছিল, ওরা আমাকে দ্রুতই অনুসরণের চেষ্টা করবে। পুরস্কারের ঘোষণা হয়তো সকাল সাড়ে এগারোটায় দেওয়ার কথা। আমি সকাল এগারোটায় বেড়িয়ে পড়লাম। দুপুরে খাবারের জন্য চলে গেলাম এডিনবার্গের বন্দর এলাকায়। তারপর একটা চিত্রকর্ম প্রদর্শনীতে গেলাম। বাড়িতে ফিরে এলাম প্রায় দুপুর তিনটার দিকে। খবরটা আমাকে প্রথম জানায় আমার এক প্রতিবেশি। আমি হেঁটে বাড়ি ফিরছিলাম। প্রতিবেশি তার গাড়ি থামিয়ে আমাকে জানায়। সে রাস্তা পেরিয়ে বলল, 'তোমাকে অভিনন্দন। আমার মেয়ে এই পুরস্কারের কথা বলতে লন্ডন থেকে আমাকে ফোন করেছিল।' তখন জিজ্ঞেস করলাম, 'কীসের পুরস্কার?' সেই প্রতিবেশীর কাছ থেকে প্রত্যাশিত উত্তরই পেলাম। বাড়ি ফিরে ফোন বার্তায় সেই খবর আবার পাই আমি।

(সূত্র ঃ নোবেল প্রাইজ ডট অর্গ)

সমীক্ষা ঃ

পটল চাষ ঃ চাষীরা কতটা লাভবান হচ্ছেন ?

[বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ'র বনগাঁ শাখার সদস্যদের উদ্যোগে রাজ্যের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বনগাঁ থানা এলাকার ধর্মপুর, পুরাতন বনগাঁ, প্রতাপনগর, হানিডাঙ্গা, জিয়ালা, পানচিতা (চাঁদা) এর কিছু কিছু চাষীদের সঙ্গে কথা বলে এলাকায় সবজি, বিশেষত পটল চাষ করে কৃষকদের লাভ-লোকসান কি হচ্ছে তার সমীক্ষা রিপোর্ট তুলে আনা হয়েছে। পাঠকদের অবগতির জন্য সমীক্ষণের সমীক্ষা কলমে তা প্রকাশ করা হল। – সম্পাদক, সমীক্ষণ]

আমরা বাজারে গেলে সবসময়ই বিভিন্ন সব্জি দেখতে পাই। সময়ের ব্যবধানে একই সব্জির বিভিন্ন সময় বাজারে বিভিন্ন রকম দাম। উচ্ছে, বেগুন, পটল, মূলো, ঝিঙে, আলু, গাজর, বিট, লাউ, লঙ্কা, কাঁকরোল, পেঁপে, কুদরী নানান জাতের শাক এর দাম নানা সময়ে নানা রকম। কারখানায় তৈরি মালের মত এইসব সব্জির কোন এমআরপি (খুচরো বাজারে সর্বোচ্চ দাম) বলে কিছু হয় না। কোন কোন কৃষক সংগঠন বা বিজ্ঞান মনস্ক দাবি তুললেও ধান, গমের মত সব্জির ক্ষেত্রে সরকার ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) স্থির করে নি। বাজারে যোগান-চাহিদা এবং বড় ব্যবসায়ীদের দ্বারা যোগানকে কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রণের দ্বারা দাম নির্দিষ্ট হয়। বছরের অধিকাংশ সময় সাধারণ মানুষকে (খরিদ্দার) অগ্নিমূল্যে সব্জি কিনতে হলেও চাষীরা এই চাষ থেকে কতটা লাভবান হন? বাজার থেকে শহরের মানুষ যখন ১০০-১৫০ টাকা কেজি দরে পটল কেনেন তখন হয়ত মনে হয় পটলচাষীরা প্রচুর মুনাফা করছে! বাস্তব চিত্রটা কি?

অন্য সব্জির ক্ষেত্রে পরিস্থিতি প্রায় একরকম হলেও এই সমীক্ষায় আমরা মুখ্যত পটল চাষে চর্চা সীমাবদ্ধ রাখবো।

আমাদের এখানে বিভিন্ন জাতের পটল চাষ হয়। বোম্বাই পটল (খুব ভালো মানের), হরিপদখালি, কাঠি পটল, মধুকুলকুলি ইত্যাদি। এদের আকার, রঙ এবং স্বাদেরও তারতম্য আছে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে পটল গাছ হল লতা জাতীয় উদ্ভিদ। ইংরাজিতে একে পয়েন্টেড গোর্ড (Pointed goured) বা পর্বল (এই পর্বল শব্দটি হিন্দি থেকে এসেছে)। পটল এর বিজ্ঞান সম্মত নাম *Trichosanthes dioica* (ট্রাইকোস্যানথেস ডিওইকা)। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, অসম, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও অন্যান্য কিছু রাজ্যে পটল চাষ হয়ে থাকে। প্রতিবেশি বাংলাদেশেও পটলের ব্যাপক চাষ হয়। পটলে প্রচুর পরিমাণে শর্করা, ভিটামিন এ এবং ভিটামিন সি এবং অল্প পরিমাণে ম্যাগনেশিয়াম, কপার, পটাশিয়াম, সালফার ও ক্লোরিন আছে।

চাষের পদ্ধতি ঃ– চারা তৈরি – আগে রোগ বিহীন, গাঁট বিহীন ভালো মানের গাছ সংগ্রহ করে বাছাই করা লতাগুলোকে খন্ড খন্ড করে ৬-১২ ইঞ্চি অবধি কেটে, ২ ইঞ্চির মত মাটির নিচে লম্বা করে শুইয়ে মাটি চাপা দেওয়া হত। এরপর তাকে জল দিয়ে ভিজিয়ে ২-৩ সপ্তাহ রেখে দেওয়া হত। ঐ বিছিয়ে দেওয়া লতা খন্ডের গাঁট থেকে নতুন চারা গাছ হত।

কিন্তু বর্তমানে বেশিরভাগ চাষী এটা করে না, চারাগাছ কিনে আনে। কারণ পূর্বের পদ্ধতিতে চারাগাছ সব গাঁট থেকে নাও বের হতে পারে এবং লতা পচে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকে।

বর্তমানে অধিকাংশ চাষীরা বিভিন্ন নার্সারি থেকে চারা গাছ কিনে নেয়। নার্সারি শুধু পটল গাছের চারা তৈরি করে অথবা যে সব জমিতে দীর্ঘদিন পটল হচ্ছে না বা ওই জমিতে অন্য চাষ করবে সেখান থেকে চারা ব্যাপারিরা পটল গাছের লতা কিনে আনে। তারপর লতা বাছাই করে ছোট ছোট টুকরো করে যাতে প্রত্যেকটার একটা করে গাঁট থাকে। এরপর প্যাকেটে করে চাষীদের বিক্রি করে। প্রতিটি চারা তৈরিতে ৪-৫ টাকা খরচ হয় এবং বাজারে ৬-৮ এমনকি ১০ টাকাতে বিক্রি হয়।

জমি প্রস্তুতি ও চারা লাগানো – জমিতে কমপক্ষে তিনবার চাষ দিতে (কর্ষণ করতে) হবে। প্রথমবারের খরচ বিঘা প্রতি (১ বিঘা = ২০ কাঠা = ৩৩ শতক) ৪০০ টাকা, পরের দুইবার ৩০০ টাকা করে। জমিতে চুন ২০ কেজি, ফসকেট ৫০ কেজি (ফসফেটের বদলে সুফলা বা ১০/২৬ দেওয়া যেতে পারে), খৈল ২০ কেজি দিতে হয়। তারপর পিল তৈরি করতে হয়। পিলের অর্থ ৫ ফুট আকারের ঢেউ খেলানো জমি। দুই পিলের মাঝে নালা বা ড্রেন তৈরি হবে। সামান্য ঢিপির মত স্থানগুলোতে চারাগাছগুলি বসাতে হয়। এক বিঘা জমিতে ৮০০-১০০০ চারা বসানো যায়। (চিত্র)

এরপর মাচা বা ভারা তৈরি করা হয় লম্বা ঐ পিল বা সারি বরাবর ৪-৫ ফুট চওড়া এবং ২$^{১}/_{২}$-৩ ফুট উঁচু করে। প্রত্যেক সারির দুই ধার দিয়ে বাঁশের খুঁটি (চটা) বা কেনা লম্বা সরু খুঁটি পুঁতে দেওয়া হয় ৫-৬ ফুট দূরত্ব বজায় রেখে। দুই ধারের খুঁটির সঙ্গে বাঁশের চটা পেরেক দিয়ে মারা হয় বা তার দিয়ে বাধা হয়। দুই ধারে প্রত্যেক পিলে ঐ বাঁশের খুঁটির সমান করে ছোট শক্ত খিলান মারা হয় একটু বেঁকিয়ে। তারপর তার দিয়ে টানা দেওয়া হয় লম্বা বরাবর জমির মাপ হিসেবে। মাচা তৈরি করতে ১ বিগা জমিতে প্রায় ৬০০ খুঁটি লাগে যা সারি বরাবর গাঁড়া বা পোঁতা হয়। প্রতি খুঁটিতে ৫-৬ টাকা খরচ পড়ে, ৬-৭ কেজি তার লাগে,

২০০ টাকার মত কট সূতো লাগে (মাচার ওপরে তারের সঙ্গে বাধার জন্য)। খুঁটিগুলি শক্তপোক্ত করতে টানা মারা হয় ক্রস খুঁটি বসিয়ে। ১ বিঘায় এরকম ১২০-১৪০টা খুঁটি লাগে (প্রত্যেকটির দাম প্রায় ৪ টাকা)। দুই খুঁটি আটকে রাখার জন্য চটা প্রয়োজন ৩০০ পিস (প্রত্যেকটির দাম ৭ টাকা)।

অন্যান্য চাষের মতো পটল চাষে শ্রমশক্তির নিয়োজন বেশি প্রয়োজন। পিল তৈরি করতে ১ বিঘায় ৩ জন, চারাগাছ লাগানোর জন্য ৩ জন, মাচা তৈরি করতে ৬ জন মজুরের প্রয়োজন। এরপর গাছ একটু বড় হলে প্রতিদিন ১ থেকে ২ ঘন্টা করে, কচি লতা মাচার উপর তোলা, গাছের গোড়া পরিষ্কার এবং অবাঞ্ছিত লতা কাটার জন্য প্রতিদিন একজন মজুরের প্রয়োজন। প্রতিদিন 'ফুল ছোঁয়ানো' পটল চাষে একটা বড় কাজ। পটলের ক্ষেত্রে পুরুষ ও স্ত্রী গাছ আলাদা হয়। পুরুষ গাছে পুরুষ ফুল, স্ত্রী গাছে স্ত্রী ফুল হয়। পুরুষ ফুলের জন্ম হতে স্ত্রী ফুল থেকে ২৮-২৯ দিন বেশি লাগে। এই কারণে পুরুষ গাছ ৪ সপ্তাহ আগে লাগাতে পারলে ভাল হয়। ফুল ফুটলে প্রতিদিন পুরুষ ফুল দিয়ে স্ত্রী ফুলের গর্ভমুন্ডে পরাগ সংযোগ করতে হয়। এই কাজে বিঘা প্রতি ২ জন লাগে সকালে দুই ঘন্টার জন্য।

প্রতিমাসে জমিতে কমপক্ষে দুইবার জল দিতে হয় সাধারণভাবে। প্রয়োজনে সপ্তাহে একবার জল দিতে হয়। মেশিনে এক বিঘা জমিতে ১$^{১}/_{২}$-২ ঘন্টা জল লাগে। ডিজেল খরচ চাষী করে, জল কিনতে ঘন্টায় ৫০ টাকা (প্রতি বিঘা) খরচ হয়।

এছাড়া প্রয়োজন অনুসারে সার এবং কীটনাশক প্রয়োজন। মূলত সুফলা বা ১০/২৬ সার, ফিউরিডল এবং কীটনাশক দিতে হয়। প্রতি সপ্তাহে ১০০০ টাকার সার-কীটনাশক লাগে এবং তা জমিতে দেওয়ার জন্য। অন্য কাজে বিঘা প্রতি ক্ষেতমজুরের মজুরি বাবদ চাষীদের খরচ হয় ১০০০ টাকা।

সুতরাং পটল (এবং অন্যান্য সব্জি) চাষে বিঘা প্রতি এককালীন খরচের হিসাব করা কঠিন। প্রথমে এককালীন কিছু খরচ হয় এবং তারপর প্রতিনিয়ত কিছু খরচ হয়। ফেব্রুয়ারি মাসে ফলন শুরু হলে অক্টোবর মাস অবধি পটল পাওয়া যায়। দুই থেকে তিনমাস পরে ফলন ধরতে শুরু হয়। প্রথমে ২-৫ কেজি (বিঘাতে)। এরপর তা বাড়তে থাকে। ৬ মাস পর ২০০-২৫০ কেজি পটল পাওয়া যায়, ভালো চাষ হলে ৩০০ কেজি। ঠিকমত পরিচর্যা করলে এবং গাছ ভালো থাকলে ৩ বছর অবধি একটানা ফল ধরে। সপ্তাহে একবার পটল গাছ থেকে তোলা হয়।

সমগ্র চাষের প্রক্রিয়াগুলি নজর করে পাঠকরা নিশ্চই অনুমান করতে পারছেন যে চাষীরা পুঁথিগতভাবে বিজ্ঞান পড়ুন আর নাই পড়ুন পটল চাষে হাতে কলমে বিজ্ঞানের কিভাবে প্রয়োগ করেন! ধৈর্য্যশীল এবং অধ্যবয়সী প্রয়োগ ছাড়া এই চাষ অসম্ভব! কিন্তু এবার আসা যাক এই শারিরীক ও মেধাশক্তির প্রয়োগের ফলাফল পটল চাষীরা কি পায়!

বিঘা প্রতি ৬ মাসে পটল চাষে খরচ

জমি কর্ষণ (৩ বার)	৪০০+৩০০+৩০০	১০০০ টাকা
চারা গাছ (বিঘাতে ১০০০)	১০০০×৬	৬০০০ টাকা
***পিল তৈরি (৩ জন মজুর)**	৩×৩০০	৯০০ টাকা
***মাচা তৈরি (৩ জন মজুর)**	৩×৩০০	৯০০ টাকা
জল খরচ (৬ মাসে)	৬×৬০০	৩৬০০ টাকা
মাচা তৈরির সরঞ্জাম (তার, দড়ি, খুঁটি)		১০০০০ টাকা
***পরাগ সংযোগ ও পটল তোলা (৬মাস)**		১৮০০০ টাকা
সার ও কীটনাশক (৬ মাস)	২০০০×৬	১২০০০ টাকা
***সাপ্তাহিক পরিচর্যা (৬ মাসে)**		১৪৪০০ টাকা
		৬৬,৮০০ টাকা

*চিহ্নিত খরচের সবটা চাষীকে ব্যয় করতে হয় না। কারণ এই কাজের বড় অংশে পারিবারিক শ্রমশক্তি ব্যবহৃত হয়। এর মূল্য চাষীরা ধরে না। অর্থাৎ মজুর বাবদ ২৮,২০০ টাকার একাংশ (গড়ে অর্ধেক) খরচ হয়। অর্থাৎ খরচ ৬৬৮০০—১৪১০০ = ৫২,৭০০ টাকা। এছাড়া বর্ষার সময় জলের খরচ লাগে না।

ফলনের সময়, বাজারে চাহিদা ও যোগানের উপর চাষীরা পটলের দাম পায়। এই দাম সর্বোচ্চ ৬০ টাকা থেকে সর্বনিম্ন ১০ টাকা (প্রতি কেজি) হয়। গড় দাম ৩০ টাকা ধরলে, ৬ মাসে (সপ্তাহে ৪ বার) ৫০ কেজি পটলে চাষীদের আয় হয় ৩০×৪×৫০×৬ = ৩৬০০০ টাকা।

৬মাসে পটল চাষের হিসাব করলে চাষীদের এই সময়কালে প্রায় ৩০,০০০ টাকা লোকসান ধরা পড়ে। কিন্তু বাস্তবে এই লোকসান হয় না। প্রথমে খরচ বেশি হলেও পরে সার, কীটনাশক এবং জমিতে শ্রমশক্তির দাম (মজুরি) বাবদ খরচটাই শুধু করতে হয়। পটলে হাজা ধরনের রোগ, লতা পচে যাওয়া, পাতা মুড়িয়ে যাওয়া (একে চাষীরা তুলশি পড়া বলে) যদি না হয় তবে পরবর্তীতে আয়-ব্যয়ের সমতা ফিরে এসে চাষীরা লাভের মুখও দেখতে পায়। যদিও কোন চাষীরই নিজস্ব এবং পরিবারের কারো মজুরির খরচ ধরে না। বাস্তব হল চাষীরা যেটাকে লাভ বলে সেটা হল তার এবং পরিবারের মজুরির দাম। অন্যান্য চাষের মতো পটল চাষেও লাভের গুড় পিপঁড়ায় (বড় ব্যবসায়ী ও পাইকাররা) খায়।■

পাঠকের কলম ঃ

ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি এবং সাধারণ মানুষ!

– রঞ্জিত মন্ডল

ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি (এনপিপিএ) সম্প্রতি এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে যে স্টেরয়েড, অ্যান্টিবায়োটিক, পেইনকিলার (ব্যথা-যন্ত্রণার ওষুধ), ভিটামিন, রক্তচাপ-সুগার-কোলেস্টেরল এবং জ্বর সর্দি কাশির মত প্রায় ৮০০ রকম ওষুধের দাম বাড়তে চলেছে ১লা এপ্রিল ২০২৪ থেকে। শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের অধীন উপদেষ্টামন্ডলীর সুপারিশ মেনে, হোলসেল প্রাইস ইনডেক্সের তথ্য অনুযায়ী ৭২৬ রকমের ওষুধের ঊর্ধ্বসীমা স্থির করা হয়েছে। যা পুরানো দামের থেকে ০.০০৫৫১% বেশি। খুচরা বাজারে স্বাভাবিকভাবেই এই দাম আরও বাড়বে। নিত্য প্রয়োজনীয় ওষুধের এই মূল্যবৃদ্ধি ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের জন্য স্থির করা হয়েছে। ২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষে এই ওষুধগুলির দাম বৃদ্ধির ছাড়পত্র পাইকারি বাজারে ১০% এবং ২২৩-২৪ আর্থিক বর্ষে ১২% দেওয়া হয়েছিল।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে বাজারে আমরা দুই ধরনের ওষুধ দেখতে পাই।

ব্র্যান্ড মেডিসিনে অনেকগুলি উপাদান থাকে। অনেকগুলি উপাদানের মধ্যে একটি উপাদান হল রোগ দূরীকরণের মুখ্য উপাদান। এই মুখ্য উপাদানকে আমরা জেনেরিক মেডিসিন বলে জানি।

কিন্তু রোগ দূরীকরণের প্রক্রিয়ায় অনেকগুলি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া (side effects) হয়। এই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলি আমাদের নানা কষ্ট দিতে পারে রোগ মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও। এই জন্য (ব্র্যান্ড মেডিসিনে) কিছু ভিটামিন ও অন্যান্য পাশ্বপ্রতিক্রিয়া প্রশমনের জন্য অন্যান্য উপাদান মূল উপাদানের সঙ্গে মেশিনের সাহায্যে মিশিয়ে প্রস্তুত করা হয়। এই উপাদানগুলির পরিমাণ ০.৫-০.২ শতাংশ হয়ে থাকে। এছাড়া ব্র্যান্ড মেডিসিনকে অনুমতি পেতে গেলে বহু প্রাণী এবং মানুষের শরীরে প্রয়োগ করে তার নিরাপত্তা ও কার্যকারিতার প্রমাণ করতে হয়। যাকে বলে ক্লিনিকাল ট্রায়াল।

জেনেরিক মেডিসিন হল শুধুমাত্র রোগ প্রতিরোধক মুখ্য উপাদান। এই মেডিসিনকে কোন ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের মধ্য দিয়ে যেতে হয় না। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া প্রশমনের উপাদান-ও থাকে না। এই কারণে জেনেরিক মেডিসিন প্রস্তুতির খরচ কম হয়।

বাজারে আবার দুইরকম জেনেরিক মেডিসিন বিক্রি হয় – একপ্রকার মেডিসিনের গায়ে ব্র্যান্ড মেডিসিনের সমান দাম লেখা থাকে। সেই ওষুধ আবার বাজারে ৫০-৮০ শতাংশ ছাড়ে বিক্রি হয়। রাজ্য সরকারি হাসপাতালে ন্যায্যমূল্যের ওষুধ হিসেবে এই জেনেরিক মেডিসিন কোথাও ৫০ শতাংশ ছাড়ে (যেমন উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল), কোথাও ৬৭ শতাংশ ছাড়ে, কোথাও ৭৬ শতাংশ ছাড়ে (এনআরএস বা ডেন্টাল কলেজ) এ বিক্রি হয়। রাজ্য সরকার বিভিন্ন ওষুধের কোম্পানিকে এই ওষুধ বিক্রির অনুমতি দিয়েছে এবং তারা এই ওষুধ সস্তায় বিক্রির নামে চড়া দামে বেচছে। পাইকারি বাজার থেকে (কলকাতার বড়বাজার) এই জেনেরিক মেডিসিন ৮০-৯০ শতাংশ ছাড়ে পাওয়া যায়। গ্রামে গঞ্জে বহু ব্যবসায়ী অত্যন্ত চড়া লাভে এই ওষুধ বিক্রি করে চলেছে। আবার বাজারে 'প্রধানমন্ত্রী জনওষধি' দোকানে ব্র্যান্ড মেডিসিনের তুলনায় ৮০-৮৫ শতাংশ কমে জেনেরিক মেডিসিন বিক্রি হয়। যদিও এই দোকানগুলিতে অধিকাংশ ওষুধ পাওয়া যায় না এবং এই ওষুধের কার্যকারিতা নিয়ে বহু ডাক্তারদের মনে সন্দেহ আছে।

এখন জেনেরিক মেডিসিন সম্পর্কে অধিকাংশ ডাক্তারদের আপত্তি আছে এর কার্যকারিতা এবং উপাদানের সঠিক পরিমাপ নিয়ে। ফলে অধিকাংশ রুগী এই ওষুধ ব্যবহার প্রসঙ্গে ধন্দে থাকে। এত দামের ফারাক হওয়াতে ও ডাক্তার বাবুর মানা থাকায় ওষুধের কার্যকারিতা নিয়ে তাঁদের মনেও প্রশ্ন থেকে যায়। সঠিক উত্তর পাওয়ার উপায় নেই।

ব্র্যান্ড মেডিসিন আবার বিভিন্ন কোম্পানি আলাদা ব্র্যান্ডে বিক্রি করে পৃথক পৃথক দামে। চড়া হারে মুনাফার সুযোগ থাকায় ব্যবসায়ীরা খরিদ্দারকে আবার নানা হারে ছাড় দেওয়া শুরু করেছে। এই ছাড় কোথাও ১০ শতাংশ, কোথাও ২০ শতাংশ, কোথাও ২৫ শতাংশ।

তাই যেসব পরিবারে বয়স্ক মানুষ আছেন বা ক্রনিক রুগী আছেন তাদের ওষুধের খরচ বাঁচানোর জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে হয়। ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটির অনুমতি এবং অনুমতি ছাড়া প্রতিবছর এক থেকে দুইবার ওষুধের দাম বাড়ছে। মানুষ নাজেহাল হয়ে পড়ছেন।

দেশে ওষুধের বাজার ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ছিল ৪২ বিলিয়ন (১ বিলিয়ন = ১০০ কোটি) মার্কিন ডলার, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে এই বাজার বেড়ে হতে চলেছে ৬৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৩১শে মার্চ ২০২৩-এর হিসাব অনুসারে দেশের সবথেকে বড় ১০টি ফার্মা কোম্পানির হাতে ছিল ৭৭,০৯৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাজার। এর মধ্যে সান ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির সর্বাধিক ২৮,৭৩৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ডঃ রেড্ডিস ল্যাবরেটরিস লিঃ এর ৯,৩৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, সিপলা লিঃ এর ৮,৮৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সান ফার্মা ২০২১ এর তুলনায় ২০২২ এ ১৫.৪ শতাংশ বেশি মুনাফা করেছে, সিপলা এই পর্যায়ে ১৩.৬ শতাংশ বেশি মুনাফা করেছে। এদের মুনাফার

পাহাড় ক্রমশ উঁচু হচ্ছে জনতার ঘাম রক্ত শোষণ করে।

ওষুধের বাজারে এইসব দৈত্যাকার কোম্পানিরা শুধুমাত্র ব্র্যান্ড মেডিসিন বিক্রি করে না, জেনেরিক মেডিসিনও বিক্রি করে। ওষুধের কার্যকারিতা কোনটার কি আছে তা সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা অসম্ভব। তাই মাছের বাজারের মত ওষুধের বাজারেও হরেক দামে একই মাল বিক্রি হচ্ছে। একই পোনা মাছ ১৬০-৩০০ টাকা কেজি! যার পকেটের জোর যেমন সে কিনবে তেমন মাল! আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক মানব সভ্যতা যতদিন মুনাফার লক্ষ্যে পরিচালিত হবে ততদিন এমনই চলবে। আপামর মানুষের সচেতনতাবৃদ্ধি ছাড়া প্রতিরোধ শুরু হবে না। ■

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে সচেতন হোন!

– রীতা দেবনাথ

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ তার সাম্প্রতিক ত্রৈমাসিক বিদ্যুৎ বিলে (মে-জুলাই ২০২৪) ১লা এপ্রিল থেকে নতুন বিদ্যুৎ এর ইউনিট পিছু টারিফ (মূল্য) নিঃশব্দে বাড়িয়ে দিয়েছে। ইউনিট পিছু টারিফের হার না বাড়িয়ে স্ল্যাব ভেঙে কার্যত ১২-২৪ শতাংশ হারে টারিফ বাড়িয়েছে।

১লা এপ্রিল ২০২৪-এর আগে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের টারিফ (মূল্য) ছিল –

ইউনিট অবধি	প্রতি ইউনিট
০-৭২	৫.০০ টাকা
৭৩-১২৮	৬.২৪ টাকা
১২৯-২১৩	৬.৮৯ টাকা
২১৪-৪২৬	৭.৪৪ টাকা
৪২৭-৬৩৯	৭.৪৮ টাকা
৬৪০-৯২৮	৯.২২ টাকা

১লা এপ্রিল ২০২৪ থেকে এই টারিফের হার হবে –

ইউনিট অবধি	প্রতি ইউনিট
০-৩০	৫.০০ টাকা
৩১-৫২	৬.২৪ টাকা
৫৩-৮৭	৬.৮৯ টাকা
৮৮-১৭৪	৭.৪৪ টাকা
১৭৫-২৬১	৭.৬১ টাকা
২৬২-৩৭৯	৯.২২ টাকা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের অধীন মূল কলকাতার বাইরে সমগ্র রাজ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে এবং টারিফের মূল্য আগাম নিয়ে নেয় যেমন মে-জুন মাসের বিদ্যুতের আনুমানিক আগাম দাম এপ্রিল মাসে নিয়ে নেয়। ব্যবসায়িক বা শিল্পক্ষেত্রে হার অনেক বেশি।

রাজ্যের রাজধানী কলকাতা এবং সংলগ্ন অঞ্চলে বিদ্যুৎ সবরাহ করে আর পি সঞ্জীব গোয়েঙ্কা গ্রুপের ক্যালকাটা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিমিটেড সংস্থা। এই সংস্থা মাসিক বিল নেয়, আগাম বিল নেয় না। বর্তমানে সিইএসসি-র বিদ্যুতের টারিফের হার –

ইউনিট অবধি	প্রতি ইউনিট
০-২৫	৫.১৫ টাকা
২৬-৬০	৫.৬৯ টাকা
৬১-১০০	৬.৭০ টাকা
১০১-১৫০	৭.৪৫ টাকা
১৫১-২০০	৭.৫২ টাকা
২০১-৩০০	৭.৬২ টাকা
৩০১-৩৪৮	৮.২১ টাকা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এবং সিইএসসি-র এই বিদ্যুতের টারিফ ঘরোয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ব্যবসায়িক বা শিল্প ক্ষেত্রে এই তারিফের হার অনেক বেশি।

গ্রাহকদের বিদ্যুতের মাসুল শুধুমাত্র কত ইউনিট খরচ হল তার হিসেবে দিতে হয় এমন নয়। এর সাথে রয়েছে মিটার ভাড়া, সরকারকে প্রদত্ত কর, স্থায়ী ডিমান্ড চার্জ এবং পুরানো বিলের সাথে অ্যাডজাস্ট করা অর্থ। সিইএসসি এলাকায় একজন গ্রাহক মাসে ৩৩২ ইউনিট খরচ করলে তাকে ৯.২২ প্রতি ইউনিট হারে মাসুল + ১০ শতাংশ সরকারি ডিউটি + প্রতিমাসে ১০ টাকা মিটার ভাড়া + প্রতিমাসে স্থায়ী ডিমান্ড চার্জ ১৫ টাকা মিলিয়ে বিল হয় ২৮৩০ টাকা। সময়মত বিল জমা দিলে ১ শতাংশ রিবেট দিয়ে বিল হয় ২৮১০ টাকা।

সারা দেশে নানা সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা বিদ্যুৎ উপাদন ও সরবরাহ করছে কিন্তু বিদ্যুতের মাসুল বিভিন্ন রাজ্য এবং শহরে পৃথক। যেমন কর্ণাটক রাজ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে BESCOM। সম্প্রতি এই সংস্থা বিদ্যুতের মাসুল কমিয়েছে। রাজ্যে ঘরোয়া বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রে সরকার ২০০ ইউনিট অবধি ব্যবহারকারীদের কোন মাসুল দিতে হবে না এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে প্রতি ইউনিট ৭.০০ টাকা বদলে ৫.৯০ টাকা দিতে হবে। হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুতের মাসুল প্রতি ইউনিটে ৭.৭৫ টাকার বদলে কমিয়ে করা হয়েছে ৭.২৫ টাকা।

তামিলনাড়ু রাজ্যে ঘরোয়া ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য বিদ্যুতের মাসুল প্রথম ১০০ ইউনিট ফ্রি করা হয়েছে। ১০১-২০০ ইউনিট ৩.৫০ টাকা হরে, ২০১-৫০০ ইউনিট ৪.৬০ টাকা হারে এবং ৫০১-৭৫০ ইউনিট ৬.৬০ টাকা হারে নেওয়া হচ্ছে।

দিল্লীতে ২০০ ইউনিট অবধি প্রতি ইউনিট ৩.০০ টাকা হারে, ২০১-৪০০ ইউনিট ৪.৫০ টাকা হারে, ৪০১-৮০০ ইউনিট ৬.৫০ হারে, ৮০১-১২০০ ইউনিট ৭.০০ টাকা হারে রাখা হয়েছে।

হায়দারাবাদ শহরে আবার পশ্চিমবঙ্গের হারে মাসুল নেওয়া হচ্ছে। এখানে ২০০ ইউনিট অবধি ৫.১০ টাকা হারে, ২০১-৩০০ ইউনিট ৭.৭০ টাকা হারে, ৩০১-৪০০ ইউনিট ৯.০০ টাকা হারে এবং ৪০১-৮০০ ইউনিট ৯.৫০ টাকা হারে মাসুল নেওয়া হয়।

মুম্বই শহরে আবার ১লা এপ্রিল ২০২৪ থেকে বিদ্যুতের মাসুল ১১.৬৯ শতাংশ হারে বাড়ানো হয়েছে। এখানে ১০০ ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের মাসুল ছিল ৩.৬৯ টাকা। একে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৫.৩০ টাকা। ১০০-৫০০ ইউনিটে মাসুল ছিল ১১.৬৯ টাকা, একে বাড়িয়ে করা হয়েছে ১৫.৭১ টাকা।

ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে মুখ্যত কয়লা ব্যবহৃত হয়। অচিরাচরিত শক্তি, পারমাণবিক বিদ্যুৎ, জলবিদ্যুৎ এবং পেট্রোলিয়ামজাত বিদ্যুৎ এখনও প্রধান নয়। বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ মুখ্য কয়লার দামের উপর নির্ভর করে। বর্তমানে ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত কয়লার দাম টন পিছু ৬০০০ টাকা। সাম্প্রতিককালে এই দাম বেড়েছে ২.০৮ শতাংশ। প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচ হয় ০.৫৬ কি.গ্রা. কয়লা। অর্থাৎ প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লার জন্য খরচ হয় ৩.৩৩ টাকা। অন্যান্য খরচ কত হতে পারে যার জন্য প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের মাসুল ৫ টাকা থেকে ১৯.২২ টাকা হতে পারে? অধিকাংশ উৎপন্ন বিদ্যুৎ ব্যবহার হয় ব্যবসায়িক ও শিল্পক্ষেত্রে। এই দুটি ক্ষেত্রে বিদ্যুতের টারিফ বহুগুণ বেশি। তাই বিদ্যুতের টারিফ এত কেন এটা মাথায় ঢোকা সত্যই সাধারণ মানুষের কম্মো নয়! এর হিসাব বোঝেন পুঁজিপতি আর সরকারি কর্তাব্যক্তিরা! ■

প্রশ্ন ও উত্তর ঃ

খাবারের স্বাদের সঙ্গে গন্ধের কোনও যোগ আছে কি?

স্বাদ ও গন্ধ দুইটি অনুভূতি (sensation)। আমরা স্বাদ ও গন্ধের অনুভূতিকে সাধারণত আলাদা ভাবি। বলে থাকি আমাদের জিহ্বার সাহায্যে আমরা খাবারের স্বাদ গ্রহণ করি ও নাকের সাহায্যে কোনো কিছুর গন্ধ অনুভব করি। কিন্তু খাবারের স্বাদের অনুভূতি (taste sensation) এবং গন্ধের অনুভূতি (smell sensation) ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এরা খাবারের স্বাদ বা ফ্লেভার (perception of flavour) সম্পর্কে আমাদের ধারণা তৈরি করতে যৌথভাবে কাজ করে। খাবারের স্বাদ ও গন্ধ একে অন্যের পরিপূরক। যখন আমরা কোনো খাবার খাই, খাবারের অণুগুলি আমাদের জিহ্বার স্বাদ কোরকের (taste buds) স্বাদগ্রাহকগুলোকে (taste receptors) উদ্দীপিত করে, যা আমাদের মস্তিষ্কে মিষ্টি, টক, তেতো, নোনতা ইত্যাদি মৌলিক স্বাদ সম্পর্কে সংকেত পাঠায়।

যাইহোক, আমরা সাধারণভাবে যাকে "খাবারের স্বাদ (taste)" বলি তা আসলে স্বাদ এবং গন্ধের মেলবন্ধন। এটি প্রকৃতপক্ষে ফ্লেভারের অনুভূতি (perception of flavour) যা স্বাদ-গন্ধ সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি জাগ্রত করে। যখন আমরা খাবার চিবিয়ে খাই বা কোনো খাবার মুখে পুরি, তখন ঐ খাবারের উদ্বায়ী অণুগুলি (volatile molecules of food) আমাদের মুখের মধ্য দিয়ে নাসিকা গহ্বরে (nasal chamber) যায়। নাসিকা গহ্বরের ছাদে ঘ্রাণ আবরণী পর্দায় (olfactory epithelium) থাকা ঘ্রাণ গ্রাহক (olfactory receptors) দ্বারা সনাক্ত হয়। এই ঘ্রাণ গ্রাহক অলফ্যাক্টরি স্নায়ুর মাধ্যমে আমাদের মস্তিষ্কের সংকেতন পাঠায়, যা স্বাদের সংকেতের সাথে একত্রিত করে 'খাবারের স্বাদ' বা ফ্লেভারের ধারণা তৈরি করে।

এই কারণে যখন কারো সর্দি হয় বা নাক বন্ধ থাকে, তখন খাবারের ফ্লেভার তিনি পান না। তখন ইলিশ মাছ আর তেলাপিয়া মাছের স্বার্দের পার্থক্য বোঝা তার পক্ষে সম্ভব নয়। একইভাবে, যদি আপনি কোনো কিছু খাওয়ার সময় বা তরল কিছু পান করার সময় আপনার নাক চেপে ধরেন, তখন কিন্তু বিভিন্ন স্বাদের মধ্যে পার্থক্য করা আপনার পক্ষে কঠিন হবে। তাছাড়া আমরা অনেকেই খাবার ঠান্ডা হয়ে গেলে খেতে পারি না বা স্বাদ পাই না। তার অন্যতম কারণ ঠান্ডা হয়ে যাওয়া খাবার থেকে খাবারের উদ্বায়ী কণাগুলো খাবারে থেকে যায়, নাকে ভেসে আসে না। এই কারণে যখন আমরা গরম গরম হিঙের কচুরী খাই বা বিরিয়ানি খাই তখন তার যে অপূর্ব স্বাদ পাই, সেই স্বাদ ঠান্ডায় নেতিয়ে যাওয়া কচুরী বা বিরিয়ানিতে পাই না।

সুতরাং, খাবারের স্বাদ এবং আমাদের নামের মধ্যে সম্পর্ক হল গন্ধের অনুভূতি আমাদের স্বাদের উপলব্ধি (perception of flavour) তৈরিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই বলা যায় গন্ধের অনুভূতি স্বাদের অনুভূতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ■

কুসংস্কার টিকিয়ে রাখে কারা?

নাগমণি ঃ অন্ধবিশ্বাস যেখানে মধ্যমণি

– পঞ্চানন মন্ডল

জ্যোতিষ সম্রাট শ্রী শ্রী কৃষ্ণকালী মহারাজের কাছে আছে সাত রাজার ধন সাপের মাথার মণি, **নাগমণি!** যা সোনা বা রূপার আংটিতে ধারণ করলে "সব বিপদ দূর হয়, ব্যবসায় সাফল্য আসে, ধনলাভ হয় সেইসাথে দাম্পত্য জীবন সুখের হয়।" এরকম অনেক বিজ্ঞাপন ও অনেক কথা আমরা শুনে থাকি।

বর্তমানে আমাদের বিজ্ঞানমনস্ক সংগঠনের মতো বিভিন্ন বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সংগঠনের লাগাতার প্রচারে সাপ ও বিভিন্ন কুসংস্কার নিয়ে সর্বসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বেড়েছে। আমরা অনেকেই মনে সাপ নিয়ে কুসংস্কার শুধু গ্রামে গঞ্জের মানুষের মধ্যে আছে। কিন্তু খাস কলকাতা ও সংলগ্ন শহরতলিতে যখন দেখা যায় এমন সাপের মণির বিজ্ঞাপন তখন আরেকবার চিন্তা করতে হয় শুধু গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষেরাই কি এই প্রতারণার ফাঁদে পা দিচ্ছে নাকি সেই ফাঁদে আটকা পড়ছে তথাকথিত "শিক্ষিত সচেতন" লোকেরাও। শহর ও শহরতলির বিভিন্ন অভিজাত এলাকার জ্যোতিষদের কাছে মূলত তারাই যাচ্ছে, যাদের আর্থিক অবস্থা ভালো। দেখা যায় রত্নপাথর দেওয়া এক-একটি আংটির জন্য খদ্দেররা লক্ষাধিক টাকা খরচ করছে। এদের মধ্যে এক দল আছে যারা ধনী তারা অনেকটা সেই গ্রামগঞ্জের সাধারণ বিশ্বাসী মানুষের মতই ফাঁদে পা দিচ্ছে। আরেকদল সংশয়বাদী। অনেক তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিও অনেক সময় "দেখি ব্যাপারটা কী" এই মনোভাবে সেখানে যাচ্ছে, ভাবছে জ্যোতিষদের থেকে রত্নপাথর নিয়ে ধারণ করলে ভাগ্যের চাকা ঘুরতে শুরু করবে। কিন্তু রত্নপাথরের কোনো প্রভাব গ্রহ নক্ষত্রের উপর বা আমাদের শরীরের উপর বা ভাগ্যের উপর নেই তা অনেকেই জানে না।

একটা প্রচলিত কথা আছে – সাত রাজার ধন নাগমণি অর্থাৎ সাত জন রাজার ধন সম্পত্তি একত্রিত করলে নাকি নাগমণির মূল্যের সমান হবে! নাগমণি বা সাপের মাথার মণি থাকার কথা কিছু প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখ আছে। আর যাত্রা সিনেমায় নাগমণির কথা হামেশাই থাকে। এ প্রসঙ্গে বলে রাখি ওঝা বা জ্যোতিষীরা বা সাপুড়েরা যা নাগমণি বলে চড়া দামে বিক্রি করে তা নাগমণি নয়। রঙিন নকল পাথর। সাপের ফনায় নাগমণি থাকে কিনা সে প্রসঙ্গে পড়ে আসছি। তার আগে নাগমণি নিয়ে প্রচলিত কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসগুলো একটু দেখে নেওয়া যাক।

নাগমণি নিয়ে কুসংস্কার

১. সাপুড়ে বা ওঝারা বলে থাকে যেসব সাপ ১০০-১০০০ বছর বাঁচে সেই সব সাপ সাপেদের রাজা। তাদের মাথায় মণি তৈরি হয়। কিন্তু এটা পুরোপুরি ভুল ধারণা। সাপ মোটেও অত বছর বাঁচে না। বিভিন্ন সাপের আলাদা আলাদা আয়ুষ্কাল আছে কিন্তু তা মোটেও ৩৫ বছরের বেশি না। যেমন হেলে সাপ বাঁচে প্রায় ৫-৬ বছর। দাঁড়াস, কেউটে, গোখরো বড়জোর ১০-১১ বছর। তবে ভারতীয় অজগর সত্যি একটু বেশি বছর বাঁচে তাও মাত্র ৩৫-৩৬ বছর। তাহলে কি প্রমাণ হলো! কোনো সাপই ১০০ বছর বা তার বেশি বাঁচেই না। তাই বেশি বছর বাঁচে এমন সাপের নাগমণি তৈরি হয় তা এক অন্ধবিশ্বাস ছাড়া কিছু নয়।

২. যে সাপ কাউকে কামড়ায় নি সেই সাপের বিষ জমে শক্ত হয়ে পাথর হয়ে যায় আর তার বিষের মহিমায় তা চকচক করে।

কিন্তু জেনে রাখুন বিষধর সাপ তার শিকার করতে তার বিষ শিকারের উপর প্রয়োগ করে। যতটুকু তার প্রয়োজন সেইটুকু তার বিষথলিতে তৈরি হয়। সেটাই শিকারের উপর প্রয়োগ করে। ব্যবহার না করে খুব বেশি জমিয়ে রাখার উপায় নেই।

৩. সাপের খুব বেশি বয়স হয়ে গেলে নাগমণির আলোর ছটায় শিকার করে।

এটাও সম্পূর্ণ ভুল কথা । সাপ রাতে বা দিনে তার স্বাভাবিক দৃষ্টি শক্তি দিয়ে চলাফেরা করতে সক্ষম। তাছাড়া সে তার চলার জন্য জিভ ও সংবেদনশীল অঙ্গ জ্যাকবসন অঙ্গের উপর ভরসা করে। তাই নাগমণির আলোর ছটা সাপের প্রয়োজন নেই।

৪. যেসব সাপের নাগমণি আছে তারা ইচ্ছাধারী হয়! মানে তারা ইচ্ছাধারী নাগ। হঠাৎ করে যেকোনো রূপ ধারণ করতে

পারে! এসব সিনেমা আর সিরিয়ালের নির্ভেজাল ঢপ। মানুষের অন্ধবিশ্বাস আর কুসংস্কারকে পুঁজি করে সিনেমা বা সিরিয়াল প্রযোজকদের মুনাফা লাভের হাতিয়ার। বাস্তবে এমন কোনো ঘটনার কোনো প্রমাণ নেই!

৫. অনেকের বিশ্বাস সাপের মাথার মণি অতি দুর্লভ বস্তু। এটা ধারণ করলে জীবন সুখ সমৃদ্ধিতে ভরে যাবে। তাই অনেকে এর জন্য অর্থ খরচ করতে কার্পণ্য করেন না, তারা যত তথাকথিত শিক্ষিতই হোক না কেন! আর এটাকেই পুঁজি করেই জ্যোতিষী আর সাপুড়েদের ব্যবসা বাড়ে। বাস্তবে কোনোরকম মণি বা রত্নপাথরের সাথে মানুষের ভাগ্যের কোনো সম্পর্ক নেই। মানুষের জটিল সমস্যাবহুল জীবনের জন্য বর্তমান পুঁজিবাদী আর্থসামাজিক অবস্থা দায়ী।

সাপের মাথায় মণি আছে আর তা চড়া দামে বিক্রির ধান্দায় "জ্যোতিষরা বা সাপুড়েরা নিচ্ছে কিছু কৌশলের আশ্রয়। আর এদের চক্করে পড়ে বোকা বনে গিয়ে অনেকেই বহু অর্থ খুইয়ে মানসিক অশান্তি নিয়ে ফিরে আসছেন। এটা শুধু অভিজাত এলাকার জ্যোতিষীরা না বহু জ্যোতিষী, সাপুড়ে বা ওঝা কিছু কৌশলের আশ্রয় নিয়ে লোককে মুরগি করে চড়া দামে দুর্লভ "সাপের মাথার মণি বা নাগমণির" নামে রঙিন পাথর লোককে গছিয়ে দেয়।

সাপের মাথার মণি মানে নাগমণি বস্তুটা কী?

মূলত সাপের মাথায় কোনো পাথর/মণি প্রাকৃতিক ভাবে থাকে না বা তৈরি হয় না। বিষধর সাপের বিষ তার বিষ গ্রন্থিতে তৈরি হয়ে বিষ থলিতে জমা থাকে। শিকারের সময় সাপ প্রয়োজন মতো বিষ তার বিষ দাঁতের মাধ্যমে শিকারে ঢেলে দেয়। কখনো কখনো বিষ দাঁতের কোনো গঠনগত ত্রুটি থাকলে বিষ বিষদাঁতের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে না। তখন এই বিষ জমা হয়ে বিষ থলিতে (বিষ থলিতে, মাথায় নয় কিনা!) অর্ধকঠিন আকার ধারণ করে। এটাকেই বলা যায় তথাকথিত "সাপের মাথার মণি"। এই ঘটনাটি প্রকৃতিতে খুবই দুর্লভ, ব্যতিক্রমী বলা চলে। তবে এই জন্য এটি কখনোই সাপ বা সাপের মণি কোন ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী নয় এমনকি আপনার ভাগ্য নির্ধারণের কোনো ক্ষমতাই তার নেই। আর এটি আংটিতে ব্যবহার করার মত কোন কঠিন পাথরের মতোও হয় না। তরল বিষ অর্ধকঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে একটা অনিয়ত অবয়ব তৈরি করে মাত্র। অথচ ওঝা বা সাপুড়েরা আপনাকে সাপের মাথা থেকে এনে দেবে সুন্দর আকৃতির একটি রঙিন পাথর। তার জন্য কিছু কৌশল তারা অবলম্বন করে।

কি সেই কৌশল

সে সত্যি এক মারাত্মক কৌশল। আপনার চোখের সামনে করলেও আপনি বুঝতে পারবেন না। যদি আপনি সংশয় প্রকাশ করেন সাপুড়েররা বা ওঝারা প্রমাণ করে ছাড়বে তাদের দেওয়া মণি আসলেই সাপের মণি। তারা প্রথমে আপনার সামনে একটি বড় জীবন্ত সাপ নিয়ে আসবে। আপনি নিজ হাতে কাটবেন সাপটির ফণা! সাথে সাথে মাথার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে লাল/নীল/কালো একটি চকচকে পাথর বা মণি। আসলে এরকম একটা ঘটনা চোখের সামনে ঘটার পর আপনি যত উচ্চ শিক্ষিতই হোন না কেন এর নেপথ্যের বিজ্ঞান বা কৌশলটা যদি জানা না থাকে তবে "সাপের মাথার মণি"র অস্তিত্ব আর বিশেষ ক্ষমতার ব্যাপারটা আসলে অস্বীকার করাটা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে।

আসুন এর নেপথ্যের গুপ্ত কৌশল জেনে নিই। কীভাবে **তারা সাপের মাথা থেকে নাগমণি আপনার সামনে নিয়ে আসে!**

সাপ এক প্রকার সরীসৃপ প্রাণী। এর দেহ ত্বকে, মূলদেহ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা তুলনামূলক ভাবে পুরু ও ফ্লেক্সিবল শুস্ক একটি খোলস থাকে। কাঁকড়া, আরশোলা ইত্যাদি সন্ধিপদ পর্বের প্রাণীদের যেমন থাকে। এই খোলস সাপের দেহকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের যখন সাপের দেহের বৃদ্ধি ঘটে তখন সাপ তার খোলস পরিবর্তন করে। বৃদ্ধি শেষে তার দেহে এমন আরেকটি পুরু ও ফ্লেক্সিবল খোলস তৈরি হয়ে যায়। আমরা সাপের বাইরে এই খোলস টিকেই দেখি। যাদের গ্রামের মানুষ বা গ্রামে যাতায়াত আছে তারা হয়ত এরকম সাপের খোলস পড়ে থাকতে দেখে থাকতে পারেন। একটি পরিণত সাপের খোলস ত্যাগের কিছুদিন আগে খোলসটি ভেতরের সাপের দেহের সাথে চামড়ার মত লাগানো থাকে না, অনেকটা আলগা হয়ে যায়। অনেকটা চিংড়ি ও কাঁকড়ার খোলসের মতো ফাঁপা অবস্থায়। এই খোলসের ভেতর সাপের মূল দেহ থাকে। আপনি চাইলে সাপের এই খোলসের এক প্রান্ত একটু কেটে টান দিলে ভেতরের পুরো সাপটিকে খোলস থেকে বের করে আনতে পারবেন। সাপের এই বৈশিষ্ট্যটিই উপর রচিত হয় নাগমণির চিত্রনাট্য!

কিভাবে সাপুড়েরা লোক ঠকায়

এই সাপুড়েরা প্রথমে একটি পরিণত সাপের ব্যবস্থা করে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা বিষহীন বা বিষ দাঁত ভাঙা বয়স্ক সাপ এই কাজে ব্যবহার করে। তারপর তারা সাপের লেজের দিকে অল্প একটু কেটে সেখানে একটি রঙিন পাথর প্রবেশ করায়।

তাহলে পাথরটি থাকে সাপের পাতলা চামড়ার বাইরে এবং শক্ত খোলসের নিচে। তারপর রাবারের টিউবের মত চেপে চেপে লেজের দিক থেকে পাথরটাকে সাপের মাথায় নিয়ে আসা হয়। এই সম্পূর্ণ কাজটি ঘটে আপনার অগোচরে, আগে থেকে ধরা কোন বয়স্ক সাপের মধ্যে।

হঠাৎ কোনো গ্রামে একদল সাপুড়ে চলে আসবে। গ্রামের কোনো সচ্ছল পবিরার দেখে তাদের বাড়িতে হানা দেবে। বিশেষ করে যাদের বাড়িতে ঠাকুর থান আছে। মানে 'মা মনসা/মা কালী/ মা শীতলার' মন্দির আছে। তার আগে তারা পূর্বে বর্ণিত কৌশলে মণি ঢোকানো একটি সাপ বাড়ির জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসবে। প্রথমে তারা সাপের খেলা দেখিয়ে লোক জড়ো করবে। খেলা শেষ হলে বাড়ির কর্তা বা গিন্নিকে বলবে আমি আপনার বাড়িতে একটা সাপের গন্ধ পাচ্ছি! মনে হয় খুব পুরনো সাপ। সে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। তার মাথায় দুর্লভ নাগমণি থাকতে পারে! বাড়ির মালিক বা প্রতিবেশীরা বলছে 'খুঁজুন খুঁজুন'! সাপুড়েদের পাণ্ডা সাপের আরো খেলা দেখিয়ে সবাইকে ব্যস্ত রাখবে। অন্যদিকে তার চ্যালারা কোথা থেকে একটু মাটি নিয়ে এসে বলবে 'ওস্তাদ দেখুন তো সাপের গন্ধ পাচ্ছেন কিনা!' (সাপেদের গায়ে সব সময় গন্ধ থাকে না মেটিং সিজিনে ফেরোমনের কটু গন্ধ থাকে কিন্তু সেটা মাটি শুঁকে বলা যায় না!) সাপুড়েদের ওস্তাদ গন্ধ শুঁকে বলবে 'এটা কেউটে বা গোখরো, ফনিমনসা বা শীষ নাগ হতে পারে।' এরপর চ্যালারা বাগানে গিয়ে আগে থেকে ছেড়ে রাখা সাপটি নিয়ে আসবে। এইবার নাটক জমিয়ে দেবে ওস্তাদ। সাপের ফনায় হাত দিয়ে বলবে 'দেখুন মাথার এই অংশটা ফুলে আছে। দেখা যাক নাগমণি আছে কিনা! কিন্তু নাগমণি আমি বের করব না। আপনাদের মধ্যে কেউ সাহস করে এসে ছুড়ি দিয়ে কেটে বের করতে পারেন। এ খুব দুর্লভ বস্তু! এটা ধারণ করলে অমুক হয় তমুক হয়।' অনেকেই শুনেছেন সাত রাজার ধন সম্পত্তি একত্রিত করলে এই নাগমণির সমান হয়। বিশাল ধন সম্পদলাভ হয়। ব্যাস, সাপের মাথা কেটে একটা পাথর বের করা হলো (যেটা আগে থেকেই সাপুড়েরা সাপের মাথায় ওই কৌশলে ঢুকিয়ে রেখেছিল)। সাপুড়ে সাপের মাথা থেকে মণি বের করার কাজ নিজে করতে পারে বা যে কেউ করতে পারে। তবে সাপুড়েরা যে বাড়িতে ঢুকেছে সেই বাড়ির কাউকে দিয়ে কাজটি করায়। তাহলে ব্যাপারটা 'মোর অথেন্টিক' হয় আরকি! এরপর এই নাগমণির আরো মাহাত্ম্য বর্ণনা করে চড়া দাম হাঁকায়। তা মোটামুটি পার্টির অবস্থা বিবেচনা করে ১০০০০ থেকে ৫০০০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। এতো টাকা দাম জেনেও আনন্দে গদগদ হয়ে টাকা দিয়ে অনেকেই কিনে নিতে পায়। কেউ নিজের হাতে সাপের মাথা কেটে নাগমণি বের করলে তার তো আর অবিশ্বাস করার উপায় থাকে না! এরপরও আশেপাশের অবিশ্বাসী কেউ যদি বলে 'এই মণি থেকে আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে না কেন?' তখন বলা হবে 'এখন সদ্য বের করা হয়েছে, কাঁচা আছে তো তাই আলো বের হচ্ছে না; মা মনসার সামনে রেখে পুজো দেবেন, আস্তে আস্তে আলো ঠিকরে বের হবে আর আপনার বিপুল লক্ষ্মীলাভ ঘটবে।' এই বলে নাগমণি বলে রঙিন পাথর গছিয়ে টাকা হাতিয়ে সাপুড়েও হাওয়া হবে।

নাগমণি রহস্যের নেপথ্যে থাকা এই গুপ্ত বৈজ্ঞানিক কৌশলটা যদি আপনার জানা না থাকে তাহলে আপনার বিশ্বাস করে নেওয়াটা অস্বাভাবিক না যে সাপের মাথায় মণি থাকে, সেটা খুব দামী ও ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী! কিন্তু এসব জ্যোতিষী বা সাপুড়েদের বুজরুকি ছাড়া কিছু নয়। এভাবে তারা লোকের অন্ধবিশ্বাসকে পুঁজি করে টাকা আত্মসাৎ করে। আমাদের অন্ধবিশ্বাস আর অসচেতনতা তাদের কাছে পুঁজি।

আমাদের কী করণীয়

তাই আমাদের বিজ্ঞান ও যুক্তির পথে চলতে হবে। সব কিছু খতিয়ে দেখতে হবে। মনে রাখতে হবে পৃথিবীতে কোনো কিছু অলৌকিক নয়। সেইজন্য কোনো রত্নপাথরের কোনো অলৌকিক ক্ষমতা নেই। সব কিছুই কার্যকারণ সাপেক্ষ। তাই বিজ্ঞানের যুক্তি দিয়ে এইসব অন্ধবিশ্বাস ও অপবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ গড়তে হলে কুসংস্কার, অবিজ্ঞান, অপবিজ্ঞান রুখতে হবে। বিজ্ঞান মনস্ক মানে এই নয় যে সবাই বিজ্ঞানী হয়ে উঠবে বা বিজ্ঞানে পন্ডিত হয়ে উঠবে। বিজ্ঞান মনস্ক মানে বিজ্ঞান ও যুক্তি'র আলোকে সবকিছু জানা বোঝা। শুধু বিশ্বাসে নয় বিজ্ঞান ও যুক্তির ভর করে চলা। বিজ্ঞান ও যুক্তির নিরিখে সবকিছু খুঁটিয়ে দেখা।

বিজ্ঞানচর্চা মানুষকে যুক্তি দিয়ে চিন্তা করতে শেখায়। তার মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা গড়ে তোলে। তখন সে নিজেই বিজ্ঞানমনস্ক একজন সচেতন নাগরিক হয়ে ওঠে। অন্ধবিশ্বাস নয়, নিজের বিচার বিবেচনা ও যুক্তি দিয়ে বুঝে নেয় কোনটি ঠিক আর কোনটি ভুল। সে তখন তার সহনাগরিকদের সচেতন করে তাদের বিজ্ঞান মনস্ক হতে সাহায্য করে। তাই বিজ্ঞানও যুক্তিবাদের চর্চা কুসংস্কার ও অপবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে সবচাইতে ভালো প্রতিষেধক হতে পারে। আসুন আমরা নিজেরা বিজ্ঞানমনস্ক হই, অন্যকে বিজ্ঞানমনস্ক হতে সাহায্য করি। এক অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, অপবিজ্ঞানবিহীন বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ গড়ে তুলি। ■

গল্পচ্ছলে বিজ্ঞান চর্চা ঃ

আলাপচারিতায় আইনস্টাইন ও তাঁর আবিষ্কার

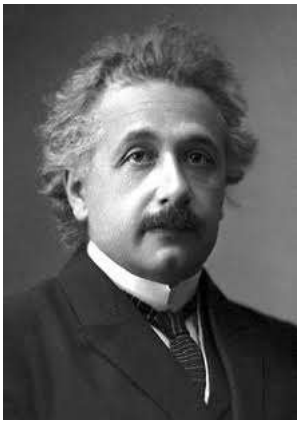

ভূমিকা ঃ বেহালা ঠাকুরপুকুর ইউনিটের উদ্যোগে ৪ঠা মে ২০২৪ ছাত্র-ছাত্রী ও উৎসাহীজনদের উপস্থিতিতে একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনারের বিষয়বস্তু 'আইনস্টাইন ও বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ'। আমরা এই আলোচনাটা প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করে তুলে ধরলাম। এই সংখ্যায় আমরা আইনস্টাইনের শৈশব-কৈশোর ও যৌবনকালের সংগ্রাম প্রসঙ্গে আলোচনা করবো। তার সঙ্গে আলোচনা করবো 'আলোক তড়িৎ ক্রিয়া' নামক যুগান্তকারী আবিষ্কার প্রসঙ্গে

আলোচক ঃ আজকে যে বিষয়টাকে নিয়ে আলোচনা করবো, তা আলোচনার মধ্য দিয়ে এগোবে। তোমরা আইনস্টাইনের নাম শুনে থাকবে, তোমরা তাঁকে কি হিসেবে জানো?

উত্তরে ঃ একজন বিজ্ঞানী ছিলেন।

প্রশ্ন ঃ কি আবিষ্কার করেছিলেন তিনি?

উত্তর ঃ জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি।

প্রশ্ন ঃ আর কারোর কোনো আইডিয়া আছে?

– ঃ কোন্ দেশের বিজ্ঞানী ছিলেন?

উত্তর ঃ আমেরিকা।

আলোচক ঃ আমেরিকায় শেষ জীবনে নাগরিকত্ব নিলেও তিনি জন্মসূত্রে জার্মান। সুইজারল্যান্ডের বার্ন শহরে পেটেন্ট অফিসে কাজ করতেন।

আলোচক ঃ আইনস্টাইনের জীবনী কেউ পড়েছো? ছেলেবেলায় নিশ্চয়ই খুব পড়াশুনোয় ভালো ছিলেন। খুব ভালো মার্কস পেতেন, কি তাই তো? এবং খুব মন দিয়ে পড়াশুনো করতেন, প্রায় ৮ ঘন্টা-১০ ঘন্টা বা তার বেশি, তাইতো?

সকলে মাথা নাড়লে প্রশ্নকর্তা বলেন –

'আইনস্টাইন এর কোনোটাই ছিলেন না। এর কোনোটাই তার ভালো লাগতো না। স্কুলে যেতে চাইতেন না। যতভাবে পারেন ফাঁকি দিতেন, এবং পড়াশুনোতো একদম করতেনই না। স্কুলটাকে তাঁর মনে হোত একটা জেলখানা। শিক্ষকদের মনে হোত জেলখানার এক একজন জেলার।

একবার পাঁচ বছর বয়সে অসুস্থ হয়ে বাড়িতে ছিলেন, তখন তাঁর বাবা তাঁকে একটা কম্পাস বা চুম্বক শলাকা দিয়েছিলেন। এই চুম্বক শলাকা উত্তর-দক্ষিণ মুখী হয়ে থাকে তো? তাঁর কাছে এই জিনিসটা বিস্ময়কর। এটা কেন উত্তর-দক্ষিণ মুখী হয়ে থাকে? কম্পাসের এই বৈশিষ্ট্য তাঁর কাছে অদ্ভুত মনে হোত। পরবর্তীকালে উনি বলেছিলেন যে একটা জিনিসকে কেন আমাদের অদ্ভুত মনে হয়? কেন অদ্ভুত মনে হয় বলে তোমরা জানো?

উত্তর ঃ জানি না।

সঞ্চালক ঃ উনি বলেছিলেন, কোনো জিনিসকে আমরা যখন দেখি তখন সে সম্পর্কে আমাদের আগে থেকেই কতগুলো বদ্ধমূল ধারণা থাকে। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে যখন সেই পূর্বেকার ধারণা মেলে না, তখন তাকে অদ্ভুত মনে হয়। তার পরবর্তীকালে ওনার এমন ধারণা হয়েছিল যে আমার মনে যা থাকবে, নিয়মগুলো (প্রকৃতির নিয়ম) যে সেরকম হবে, এমন কোনো কথা নেই। আমার দেখা, ভাবার সঙ্গে প্রকৃতির নিয়ম এক রকম নয়, অন্যরকমও হতে পারে। **আমার চেতনার দ্বারা প্রকৃতির নিয়ম পরিচালিত হয় না।** এই ভাবনাটা তার বিভিন্ন আলোচনায় উঠে এসেছে। একটা জায়গায় তিনি বলেছিলেন যে ঐ কম্পাসের ঘটনাটা থেকেই তাঁর কিন্তু প্রথম এমন চিন্তাধারা গড়ে ওঠে। ছোটবেলায় তিনি রাতে ঘুমাতেন বিছানায় কম্পাসটাকে নিয়ে। এতটাই তিনি বিমোহিত ছিলেন বিষয়টার সঙ্গে।

যাই হোক তোমাদের কাছে প্রশ্ন করছি –

– তোমাদের অঙ্ক কার কার ভালো লাগে?

– অ্যালজেব্রা কার ভালো লাগে?

– আমি এখানে উপস্থিত একজনকে জানি যার অ্যালজেব্রা ভালো লাগে না।

আইনস্টাইনেরও অ্যালজেব্রা ভালো লাগতো না। তাঁর কাকা তাঁকে একটা গল্প বলেছিলেন। গল্পটা হোল, ধর তুমি কোনো বনে শিকারে গেছো, একটা অজানা ছোট্ট প্রাণীর পিছনে ছুটছো, মনে করো ঐ অজানা প্রাণীটা হল X। এবার তুমি ধাওয়া করে ঐ প্রাণীটাকে ধরতে পারলে, তাকে মোটামুটি খাঁচাবন্দী করলে।

X এবার ধরা পড়লো। এবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ঐ X নামক অজানা প্রাণীটা যে কি তা নির্ণয় করলে। X কিভাবে ধরা পড়লো, সে একটা ইকুয়েশনের মাধ্যমে ধরা পড়লো। ধরো 2X=10 (কে ডবল্ করলে যে মানটা পাবো)। এভাবে, এই নিয়মে তাকে ধরে ফেললাম, এই সমীকরণটা প্রাণীটিকে খাঁচায় বন্দি করার সাথে তুলনা কর। এবার তুমি X কে জানবে। কিভাবে জানবে? সে বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। এই যে X এর ভ্যালু ভাইভ (5) পেলে, মানে X এর ভ্যালুকে চিনলে, এটাই অ্যালজেব্রা। আর কিছু নয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যে অজানা জিনিসটাকে জানতে চাইছো, তাকে জানতে পারবে। কাকার এই গল্প শুনে তিনি খুব অনুপ্রাণিত হলেন। এরপর থেকে ম্যাথামেটিক্সে ও ফিজিক্সে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। তিনি শুরু করেন স্কুল জীবনে ফিজিক্স, ম্যাথস্ে ভালো ফল করতে। তাঁর লিটারেচার, জিওগ্রাফি একদম বাজে রেজাল্ট হতো, পড়তেন না। বড় হয়ে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে পদার্থবিজ্ঞান-ম্যাথামেটিক্স নিয়ে পড়তে পারেন নি। সেটা পারেন নি তাঁদের আর্থিক অবস্থার কারণে। তাঁর বাবা বলেই দিয়েছিলেন যে উচ্চতর গণিত বা পদার্থবিদ্যা পড়ানোর মতো সামর্থ্য তাঁদের নেই।

তাঁকে বলেছিলেন – 'তুমি বরং কোনো টেকনিক্যাল লাইনে পড়ো। তাহলে তাড়াতাড়ি একটা চাকরি পাবে, সেকারণে তিনি পলিটেকনিক কলেজে পড়তে অ্যাডমিশন টেস্ট দিলেন। কিন্তু অ্যাডমিশন টেস্টে অ্যালাও হলেন না। চিটাররা দেখলো এর ফিজিক্স-ম্যাথে ভালো মার্কস আছে, আর অন্যান্য সাবজেক্টে বাজে রেজাল্ট। তাহলে একে কি করা হবে? তাঁরা বললেন – 'তুমি একবছর অন্য এক জায়গায় এইসব বিষয় পড়ো, তারপর এসো।'

উনি আরাউয়ের প্রাদেশিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। সেখানে শুনলেন রাজনীতি নিয়ে, সমাজ নিয়ে, ইকনোমিক্স নিয়ে কথাবার্তা। তাঁর জীবনের যে সামাজিক দিকটা রয়েছে, সেটা তৈরি হয়েছিল ঐ সময়। যাই হোক একবছর পর তিনি পলিটেকনিক কলেজে ভর্তি হলেন ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে। সেখানে অনেক বন্ধুবান্ধব হয়ে গেল।

পলিটেকনিক কলেজ থেকে মোটামুটি পাশ করলেও রেজাল্ট খুব একটা ভালো হল না। চাকরির চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে ঘুরছেন, এমন সময় তাঁর এক বন্ধু যে টিচারি করে, তার ছুটিতে বদলিতে দু'মাসের একটা কাজ দিল। তারপর আবার বেকার। ১৮৯২-তে এক বন্ধুর বাবার সুপারিশে সুইজারল্যান্ডের বার্ন শহরের পেটেন্ট অফিসে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিলেন। সেখানকার চাকরী ছিল তৃতীয় শ্রেণীর এক টেকনিশিয়ানের।

আলোচনা সভায় উপস্থিত জনতা

পেটেন্ট অফিসে যে কাজটা হয়, তা হল এই যে বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন যে আবিষ্কার করেন, তার স্বীকৃতি নেওয়ার জন্য পেটেন্ট অফিসে আবেদন করেন। পেটেন্ট অফিস বিভিন্ন আবিষ্কারকের গবেষণাপত্রের জন্য পেটেন্ট দিত।

যদিও তিনি সেখানে তৃতীয় শ্রেণীর টেকনিশিয়ান, তবু বিজ্ঞানী মহল কী কাজ করছে সেটা দেখার সুযোগ ছিল। এইখানে চাকরি করা অবস্থায় তিনি গবেষণাপত্র লিখলেন। থিওরিটিকাল কাজ – (চিন্তা করে, অঙ্ক করে একটা নতুন তত্ত্বকে দাঁড় করানো হল থিওরিটিকাল কাজ)।

ঐ সময় (উনবিংশ শতাব্দীতে) আলো সম্পর্কে ধারণা ছিল যে আলো কণা নয়, এ হল তরঙ্গ। এটা অনেকভাবে প্রমাণ হয়েছে ইতিমধ্যে। কিন্তু তার আগে নিউটন বলে গিয়েছিলেন যে আলো কণা। তার পরে আলো যে তরঙ্গ, সে বিষয়ে খুব সুন্দর কতগুলি পরীক্ষা হয়। যার মধ্যে ইয়ং এর ডবল স্লিট এক্সপেরিমেন্ট উল্লেখযোগ্য। (চিত্র ঃ ডবল স্লিট এক্সপেরিমেন্ট দ্রষ্টব্য) উনি করেছিলেন কি দুটো ছিদ্র দিয়ে আলোকে নির্গত হতে দেন। দেখা গেল ছিদ্র থেকে নির্গত হয়ে একটা আলোর উপর আরেকটা আলো পড়ছে। পড়ার পরে পিছনে যদি একটা পর্দা রাখি, সেই পর্দায় একটা আলো-ছায়া-আলো-ছায়া-র বর্নালী ব্যান্ড বা পট্টি তৈরি হয়। এইভাবে পর্দায় এমন ব্যান্ড তৈরি হওয়ার কারণ কী? বলা হয়েছে একটা ঢেউয়ের উপর আরেকটা ঢেউ যদি এসে পরে সেক্ষেত্রে দুটো ঢেউয়ের মাথাটা যদি একই দিকে এক ধরনের হয় তবে তাদের সম্মিলিত ফল হবে, ঢেউয়ের জোর বেড়ে যাওয়া। যেখানেই দুটো ঢেউয়ের মাথা এক হবে, সেখানেই জোর যাবে বেড়ে। আবার যেখানে ঢেউয়ের নিচটা, খাঁজটা এক হয়ে যাবে সেখানে নীচের দিকে জোর বেড়ে যাওয়ায় সেখানেও আলো উজ্জ্বল হবে। কোথায় অন্ধকার হবে? যেখানে আলোর একটা ঢেউ উঠছে, আর অন্যটা নীচে নামছে। এটা

প্রমাণ করছে যে এটা হতে একমাত্র তরঙ্গেরই ধর্ম, আলো কোনো কণা হলে এটা পারতো না। অর্থাৎ **তরঙ্গের ক্ষেত্রে দুটো আলোর ঢেউ মিলেও অন্ধকার তৈরি করতে পারে।**

আলোকে তরঙ্গ বলে প্রায় সব বিজ্ঞানীরাই মেনে নিলেও কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য কণা ধর্মের। সেখানে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের একটা বিখ্যাত গবেষণাপত্রে বললেন যে এই আলো যদি কোনো ধাতুর উপর এসে পড়ে, এই ধাতুর ইলেকট্রনগুলোকে উত্তেজিত করে। তার মানে ইলেকট্রনগুলোকে শক্তি দেবে। তারপর সেই ইলেকট্রনগুলো তার থেকে বেরিয়ে আসবে। এখান থেকে তিনি একটা সিদ্ধান্তে আসেন যে, এই আলোগুলো অবিরত ধারায় পড়ে না, পরে ভাগে ভাগে, তার নাম পরবর্তীকালে দেওয়া হয়েছে ফোটন। একটা ফোটনের আবার থাকে শক্তি, সেই শক্তি নির্ভর করবে তার কম্পাঙ্কের উপর। তাহলে বলতে পারা যায় যে আলো এসে পড়ছে, তা আসলে কতগুলো ফোটনের প্যাকেট। এই এক একটা শক্তির প্যাকেট বা ফোটন এক একটা ইলেকট্রনকে উত্তেজিত করে পাঠিয়ে দিচ্ছে। একটা ফোটনের যদি বেশি শক্তি থাকে, তবে সে কিন্তু একবারে দুটো ইলেকট্রনকে বের করতে পারবে না। পরীক্ষালব্ধ ফল এর সত্যতা প্রমাণ করেছিল। বেশি শক্তি থাকলে একটা ইলেকট্রনকেই পাঠাবে বেশি গতিতে। আলোর তীব্রতা বেশি হলে অর্থাৎ বেশি সংখ্যক ইলেক্ট্রনকে ধাতু থেকে নির্গত করবে। এটা দিয়ে প্রমাণ হল আলো ঐরকম প্যাকেট আকারেই আসে। এসে ইলেকট্রনগুলোকে শক্তি দেয় এবং সেই শক্তিতে ইলেকট্রন বেড়িয়ে যায়। আলো আসলে নিরবিচ্ছিন্ন প্রবাহ নয়, কতগুলো প্যাকেট আকারে আলোক শক্তি নির্গত হয়। আইনস্টাইন এভাবে আলোর কণাধর্ম ব্যাখ্যা করলেও তাতে দারুণ একটা জিনিস ব্যবহার করলেন, তা হল প্রতিটা ফোটনের শক্তি তার কম্পাঙ্ক ও h নামক ধ্রুবকের গুণফলের সমান। এই h হল প্লাঙ্ক ধ্রুবক। অর্থাৎ ফোটনের শক্তি বাড়বে তার কম্পাঙ্ক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। এই প্ল্যাঙ্কধ্রুবক (h) যাঁর নামে নামাঙ্কিত, তাঁর প্রসঙ্গে একটু আসা যাক।

প্লাঙ্ক একটা দারুণ জিনিস আবিষ্কার করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে ব্ল্যাক বডি বা কৃষ্ণবস্তু সমস্ত বিকিরণ শোষণ করে নেয়, সে সেই আলো আবার নিঃসরণও করে (প্রতিফলন নয়)। ক্রিকেট যারা খেলে তারা সাধারণত সাদা ড্রেস পড়ে। সেটা কেন?

উত্তর ঃ সাদা আলো সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত করে।

প্রশ্ন ঃ ব্ল্যাক কি করে?

উত্তর ঃ সমস্ত আলো শুষে নেয়।

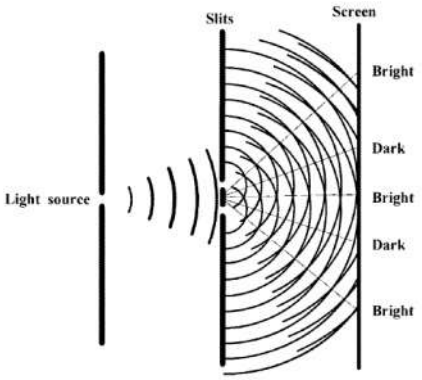

ডবল স্লিট এক্সপেরিমেন্ট

প্রশ্ন ঃ তাহলে ব্ল্যাক বডি মানে কী? ব্ল্যাক বডি আসলে খুব কালো বস্তু, যে কিনা সব আলো শুষে নেবে। তাহলে সে কি কিছু ফেরত দেবে?

উত্তর ঃ দেবে না।

সঞ্চালক ঃ আসলে কিন্তু ফিরিয়ে দেবে না বাইরের তল থেকে, সাদা পোশাকের মতো, যাকে বলে প্রতিফলন। কিন্তু যে আলো শোষণ করবে, সেই আলোকে এমিট করবে বা নিঃসরণ করবে। কালো বস্তু যত শক্তি নেয়, সেই শক্তি আবার নিঃসরণ করে দেয়। ব্ল্যাকবডি আলো নিঃসরণ কিভাবে করে, তার গ্রাফ তত্ত্বগত হিসাব মেলাতে পারছিলেন না প্লাঙ্ক। তিনি আলোক নিঃসরণকে আগেকার ধারণা অনুযায়ী নিরবচ্ছিন্ন (continuous) ধরে ছিলেন। তার ফলে প্রাপ্ত তথ্যের সঙ্গে ধারণা সঙ্গতিপূর্ণ হচ্ছিল না। এমতাবস্থায় প্রাপ্ত তথ্যের সঙ্গে গাণিতিক প্রকাশকে (expression) কে মেলাতে উনি বললেন নিঃসরণটা ধারাবাহিকভাবে হবে না, বিচ্ছিন্নভাবেই হবে। অর্থাৎ প্যাকেটের মতো হবে। সেই প্যাকেটের শক্তি হবে একটি ধ্রুবক (যাকে প্ল্যাঙ্ক ধ্রুবক h বলা হল) এবং কম্পাঙ্কের গুণফল। যদিও প্লাঙ্ক বললেন এমন ঘটনা বাস্তবে হয় না, পরীক্ষালব্ধ ফলকে গণিতের সঙ্গে মেলানোর জন্য আমি এই জিনিসটা করেছি। মানে বাস্তবে যে এমন হয় তাতে তাঁর (প্লাঙ্কের) বিশ্বাস ছিল না, প্লাঙ্ক এই কাজটা করেছিলেন ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে তার পাঁচ বছর পর আইনস্টাইনের এই কাজে প্রমাণ হল আলো সত্যিই কণা। এই আবিষ্কারকে (আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া বা ফোটো ইলেকট্রিক এফেক্ট বলা হয়) কোয়ান্টাম মেকানিকসের সূত্রপাত বলা চলে। ■

ধারাবাহিক নিবন্ধ ঃ

মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ

– হরিরাম আহমেদ

(অষ্টম পর্ব নবম অংশ)

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের পর পর্যায় সারণীর ক্রমবিকাশ হয়েছিল অনেক। মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণীর সীমাবদ্ধতাই এই ক্রমবিকাশের তাড়না জুগিয়েছিল। এই পর্যায় সারণী সকল মৌলের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারেনি। যেমন টেলুরিয়াম এবং আয়োডিনের অবস্থান নির্ণয় করা যায় নি এই পর্যায় সারণীতে। এছাড়া পূর্বে উল্লিখিত স্পেকট্রোস্কোপ যন্ত্রে ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে সৌর প্রজ্বালের বর্ণালীতে ধরা পড়েছিল হিলিয়াম নামক নিষ্ক্রিয় গ্যাস। এইরকম রাসায়নিক বিক্রিয়ায় নিষ্ক্রিয় গ্যাসের প্রকৃতিতে উপস্থিতি ধরাই পড়তো না যদি না স্পেকট্রোস্কোপ যন্ত্রের আবিষ্কার হোত। স্বভাবত মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণীতে এমন মৌলের স্থান ছিল না। এটাও ছিল এই পর্যায় সারণীর অসম্পূর্ণতা।

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী র‍্যামসে বিজ্ঞানী ক্যাভেন্ডিসের একটি পরীক্ষা পুনরায় করেন। এই পরীক্ষায় নমুনা অজানা গ্যাসটিকে উত্তপ্ত করে উজ্জ্বল বর্ণালী পেলেন স্পেকট্রোস্কোপে। নতুন প্রাপ্ত গ্যাসটি নাইট্রোজেনের থেকে ভারি যা বায়ুমন্ডলের এক শতাংশ জুড়ে রয়েছে। এর নাম দিলেন আরগন (argon) যা আসলে একটি গ্রিক শব্দ, যার অর্থ নিষ্ক্রিয়। আরগনের পারমাণবিক গুরুত্ব (সম আয়তন হাইড্রোজেনের থেকে কতটা ভারি) 45 এর নিকটবর্তী পাওয়া গেল। এর অর্থ একে পর্যায় সারণীতে সালফার (পাঃ গুঃ 32), ক্লোরিন (পাঃ গুঃ 35.5), পটাশিয়াম (পাঃ গুঃ 39) এর ঠিক পরে ক্যালশিয়ামের ঠিক আগে স্থাপন করা দরকার ছিল। কারণ ক্যালশিয়ামের পারমাণবিক গুরুত্ব 40 এর কিছুটা বেশি। কিন্তু মেন্ডেলিফ পারমাণবিক গুরুত্ব অনুসারে টেবিলটি সাজালেও আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে তিনি যোজ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর বিখ্যাত টেবিলটি প্রস্তুত করেছিলেন। (দ্রষ্টব্য ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে মেন্ডেলিফ দ্বারা পরিমার্জিত পর্যায় সারণী) যেহেতু আরগন কোনো মৌলের সঙ্গে যুক্ত হয় না, সেই হেতু তার যোজ্যতা 0 (শূন্য) হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু শূন্য যোজ্যতার মৌলের স্থান ছিল না বিদ্যমান পর্যায় সারণীতে। ফলতঃ এর সংশোধন প্রয়োজন হয়ে পড়লো। সালফারের যোজ্যতা 2, ক্লোরিন 1, পটাশিয়াম 1 এবং ক্যালশিয়ামের 2। যোজ্যতার বিন্যাস 2, 1, 1, 2, তারফলে আরগনকে ক্লোরিন ও পটাশিয়ামের মধ্যবর্তী রাখার দরকার। কিন্তু নিষ্ক্রিয় গ্যাস আরগনই কেবলমাত্র নয়, ইতিমধ্যে সৌর প্রজ্বালে যে গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছিল ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে ইউরেনিয়াম মৌল থেকে প্রাপ্ত গ্যাস সম বর্ণালীর পাওয়া গেল। এ হল হিলিয়াম। 'হেভেনলী বডি' বা 'স্বর্গীয় বস্তু' মহাকাশে ছড়িয়ে রয়েছে – এমন ধারণাকে এতকাল সমর্থন জানিয়েছিল ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে সূর্য গ্রহণকালে সৌরপ্রজ্বালে প্রাপ্ত অজানা বর্ণালী। তখনও এমন ধারণা করা যেত যে এই মর্ত্যে প্রাপ্ত বস্তুগুলির বাইরেও মহাকাশে স্বর্গীয় বস্তু রয়েছে। ভাববাদীরা এমন কুযুক্তি হাজির করলেও বস্তুবাদীদের বক্তব্য ছিল এই মহাবিশ্ব আমাদের জানা বস্তুই কেবলমাত্র নয়, আমাদের সম্পূর্ণ অজানা বস্তুদিয়েও তৈরি হতে পারে। কারণ তা আমাদের চেতনার থেকে সৃষ্টি হয় নি, বরঞ্চ আমাদের বর্তমান জ্ঞান, তার ক্রমবিকাশ হয় অজানা বস্তুজগতকে জানার মধ্যদিয়ে। সেই একই স্পেকট্রোস্কোপ যন্ত্র প্রমাণ করলো পৃথিবীতে প্রাপ্ত অজানা গ্যাসটি আসলে আরগনের মতো আরেকটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস। এর নামকরণ সূর্যের গ্রিক প্রতিশব্দ হিলিয়াম করা হল। এর ফলে পর্যায় সারণীতে আরগনের সঙ্গে হিলিয়ামও কোথায় বসবে তা নিয়ে সমস্যা তৈরি হল। হিলিয়ামের পারমাণবিক গুরুত্ব আরগনের থেকে অনেক কম। অথচ যোজ্যতার বিচারে আরগন যেখানে আছে সেখানে তার স্থান হওয়া প্রয়োজন।

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে র‍্যামসে বুঝলেন যে বাতাসে সমধর্মী এরকম আরো নিষ্ক্রিয় গ্যাসের উপস্থিতি থাকার সম্ভাবনা আছে। পৃথিবীতে হিলিয়াম আবিষ্কার এই সম্ভাবনার জন্ম দিয়েছিল। তিনি ঐ বছর বাতাসকে উত্তপ্ত করে বর্ণালী বিশ্লেষণ করে আরো তিনটি নতুন গ্যাসের সন্ধান পান। তারা যথাক্রমে নতুন অর্থে নিয়ন (neon), লুকানো বস্তু অর্থে ক্রিপটন (Krypton) এবং অপরিচিত অর্থে জেনন (Xenon)।

ফলতঃ মেন্ডেলিফের সংশোধিত পর্যায় সারণী রসায়ন বিদ্যায় প্রাপ্ত নতুন আবিষ্কার-ধারণাকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে নি। এর কারণ ছিল পরমাণুকে ক্ষুদ্রতম কণা ধরে চলা। পরমাণুর অভ্যন্তরে অতিপারমাণবিক কণা (Sub atomic particle)-এর একে একে সন্ধান প্রাপ্তিতে ডালটনের পরমাণুবাদ (এখানে

ক্ষুদ্রতম কণা পরমাণুর ধারণা সর্বশেষ ডালটনই দিয়েছিলেন বলে একে তাঁর নামে নামাঙ্কিত করা হচ্ছে।) যেমন ভেঙে পড়লো, একই সঙ্গে মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণীর ভিত্তির পরিবর্তন করতে হল। সেই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আমরা অতিপারমাণবিক কণাগুলির আবিষ্কারের প্রসঙ্গে এবার যাই। যদিও এবারও তা রসায়ন বিজ্ঞানের চর্চার আওতাভুক্ত আর থাকলো না, তা হল পদার্থ বিজ্ঞান চর্চা।

অতিপারমাণবিক কণা, যেমন ইলেকট্রন আবিষ্কারের আগে থেকেই চার্জের ধারণা মানুষ করেছে। ধরা হোত কোনো স্থানে যদি বেশ কিছুটা ধনাত্মক চার্জ উপস্থিত থাকে এবং অন্যত্র বেশ কিছু পরিমাণ ঋণাত্মক চার্জ জমা থাকে, তবে এই দুই-এর মধ্যে অনেকখানি চার্জের পার্থক্য তৈরি হবে। একে বলা হোত বিভব পার্থক্য (potential difference)। জল যেমন উঁচু থেকে নিচে পড়ে, তেমনি উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের দিকে তড়িৎ প্রবাহ হবে। বিপরীত আধানের মধ্যে ক্রিয়াশীল বলকে পরিমাপ করা হোত কুলম্বের সূত্র থেকে। এক পদার্থ থেকে অন্যত্র এই তড়িৎ প্রবাহ হয় মাধ্যম মারফৎ। ধাতুর মতো ভালো পরিবাহী মারফৎ তড়িৎ প্রবাহ হয় ভালোভাবে। অথচ কাঁচ, অভ্র, গন্ধক-এর মতো বস্তুর মধ্য দিয়ে এই প্রবাহ হতে চায় না। অনেক বেশি পরিমাণ বিভব পার্থক্য হলে তবে তা তড়িৎ পরিবহনে সক্ষম হয়। যার মধ্য দিয়ে এই তড়িৎ পরিবহন হচ্ছে, তা কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় হতে পারে। কিছু দ্রবণে তড়িৎ পরিবহন হয় ভালো করে (যেমন নুন জল) কিন্তু শূন্যস্থানে তড়িৎ প্রবাহ সম্ভব? এ বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছিলেন বিজ্ঞানী ফ্যারাডে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু তিনি অসফল হন। এরপর ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম ক্রুকস্ একটি কাঁচনলে বায়ুমন্ডলীয় চাপের সামান্য ভগ্নাংশ চাপে থাকা গ্যাসভর্তি কাঁচনলের মধ্যদিয়ে তড়িৎ প্রবাহ হচ্ছে দেখেন। এই কাঁচনল রঙিন আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। কাঁচনলে থাকা বিভিন্ন গ্যাসে এই রং বদল হতে থাকছে। তিনি এমন একটি কাঁচনল তৈরি করেন এবং এই কাঁচনলের দুই প্রান্তে রয়েছে দুটি তড়িৎ দ্বার, ঋণাত্মক তড়িৎ গ্রস্থ ক্যাথোড এবং ধনাত্মক তড়িৎগ্রস্থ অ্যানোড। এই দুই তড়িৎ দ্বারকে দুই বিভবে যুক্ত করলে তড়িৎপ্রবাহ শুরু হয়। এর আগে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের ধারণা ছিল যে তড়িৎ প্রবাহ হয় উচ্চ ধণাত্মক চার্জ থেকে নিম্ন ঋণাত্মক চার্জ যুক্ত প্রান্তে। কিন্তু ক্রুকের এই পরীক্ষায় দেখা গেল বিদ্যুৎপ্রবাহ হচ্ছে ক্যাথোড থেকে অ্যানোডে। অ্যানোডে আগত বিদ্যুৎ নিকটবর্তী কাঁচের দেওয়ালে উজ্জ্বল আলো তৈরি করছে। কাঁচের ঐ দেওয়ালের আগে একটি ধাতব পাত রাখলে কাঁচের দেওয়ালে ছায়া পড়ে (ক্যাথোডের বিপরীতে) খুব স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়েছিল ক্যাথোড থেকে আগত রশ্মি (যাকে নাম দেওয়া হয়েছিল ক্যাথোড রশ্মি) হল আলোরই এক প্রকারভেদ। কারণ আলো কণা হোক বা তরঙ্গ তার ছায়া তৈরি হবে।

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ পদার্থবিজ্ঞানী জোসেফ জন থমসন এমনই ক্যাথোড রশ্মি নিয়ে পরীক্ষা করে এক যুগান্তকারী আবিষ্কার করে ফেললেন। তিনি দেখলেন যে ক্যাথোড রশ্মি বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে (চিত্র-১ দ্রষ্টব্য)।

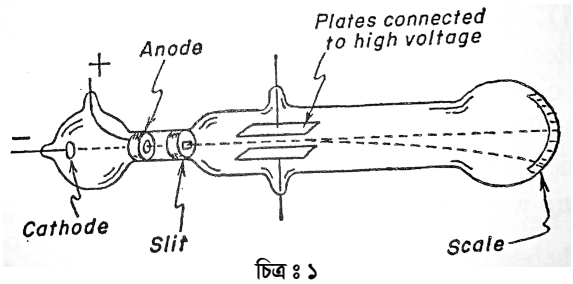

চিত্র ঃ ১

সেখান থেকে সিদ্ধান্তে আসেন যে ক্যাথোড রশ্মি হল ঋণাত্মক তড়িৎগ্রস্ত কণার স্রোত। তড়িৎ ক্ষেত্রের বদলে চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতেও এমন বিক্ষেপণ দেখা গেল। ক্যাথোড রশ্মির বিক্ষেপণ নির্ভর করে একটি নির্দিষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্রে ক্যাথোড কণা কতটা বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। তিনি তা পরিমাপ করেন। চিত্র-১-এ দেখা যাচ্ছে নির্দিষ্ট তড়িৎ চৌম্বক ক্ষেত্রে ক্যাথোড কণার বিক্ষেপণ কাঁচের দেওয়ালে রাখা স্কেলে মাপা যায়। এই বিক্ষেপণের পরিমাণ থেকে বলা যায় ক্যাথোড কণার চার্জ ও তার ভরের অনুপাত, যাকে $\left(\frac{e}{m}\right)$ দ্বারা প্রকাশ করা হল। ক্যাথোড হিসেবে বিভিন্ন ধাতু ব্যবহার করে একই ফলাফল পাওয়া গেল, অর্থাৎ এই কণা পদার্থ ভেদে বিভিন্ন নয়। বিজ্ঞানী থমসন এই $\left(\frac{e}{m}\right)$ এর মান পান 1.758×10^{8} কুলম্ব/গ্রাম, যেখানে $e=$ একটি ক্যাথোড কণার ঋণাত্মক চার্জ, $m=$ ঐ কণার ভর। বিজ্ঞানী থমসনের এই পরীক্ষার আগেই, এমনকী বিজ্ঞানী ফ্যারাডেরও ধারণা অনুসারে (যেখানে তিনি তড়িৎ বিশ্লেষণের ব্যাখ্যা করেছিলেন, সেখানে), বিদ্যুৎ তড়িতাহিত কণার দ্বারা প্রবাহিত হয়, এমন ধারণাই ছিল। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে আইরিশ পদার্থ বিজ্ঞানী জিয়র্জ জনস্টোন স্টোনি বিদ্যুতের মৌলিক এককের নাম প্রস্তাব করেন ইলেকট্রন, যদিও সেটি কণা অথবা অন্যকিছু হতে পারে, এমন তাঁর ধারণা ছিল। থমসনের ক্যাথোড

রশ্মির পরীক্ষা থেকে জানা গেছিল এটি কণা এবং এটিই বিদ্যুতের মৌলিক কণা, স্টোনি প্রস্তাব দেন যে এর ইলেকট্রন নাম দেওয়া হোক। এভাবেই ক্যাথোড রশ্মি যে ইলেকট্রন কণার স্রোত তা আবিষ্কার হোল।

এই ইলেকট্রন ঋণাত্মক আধান যুক্ত জানা ছিল। এর আধান বিজ্ঞানী মিলিকান ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে নির্ণয় করেছিলেন, এর মান 1.602×10^{-19} কুলম্ব। সুতরাং পূর্বে বর্ণিত $e=1.602\times10^{-19}$ কুলম্ব।

এর ফলে একটি ইলেকট্রনের ভর

$$m=\frac{e}{\left(e/m\right)}=\frac{1.602\times10^{-19}}{1.758\times10^{8}}\ \text{গ্রাম}$$

$$=\left(\frac{1.602}{1.758}\right)\times10^{-27}\ \text{গ্রাম}=0.911\times10^{-27}\ \text{গ্রাম}$$

$$=9.11\times10^{-28}\ \text{গ্রাম}$$

সে সময় হাইড্রোজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব নির্ণীত ছিল এবং তা ছিল 1.008, বিজ্ঞানী মিলিকান দেখান যে এই ইলেকট্রন একটি হাইড্রোজেনের 1/1837 গুণ ভর সম্পন্ন। অর্থাৎ আমাদের জানা সব থেকে হাল্কা পরমাণু হাইড্রোজেনের থেকেও এই কণা বহুগুণ হাল্কা। এমনই কণা ক্যাথোডরূপী ধাতব পাত থেকে নির্গত হচ্ছে, এর অর্থ পরমাণুর অভ্যন্তরে রয়েছে তার থেকেও ক্ষুদ্র কণা ইলেকট্রন।

এমন ক্ষুদ্র ঋণাত্মক চার্জযুক্ত কণা ইলেকট্রন ছিল সেসময় আবিষ্কৃত ক্ষুদ্রতম ঋণাত্মক চার্জ সম্পন্ন কণা। ১৮৮০-র সময়কালে বিজ্ঞানী আরহেনিয়াস আয়নের ধারণা দেন এবং বলেন যেকোনো তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ বিপরীত আধান সম্পন্ন আয়নে বিভাজিত হয়ে যায়। সে সময় রসায়ন বিজ্ঞানীদের কাছে এই ধারণা একেবারেই গ্রাহ্যতা পায় নি। কিন্তু ইলেকট্রন আবিষ্কারের পর আরহেনিয়াসের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া গেল। যেমন তাঁর ক্লোরাইড আয়নকে এবার বলা গেল একটি ক্লোরিনের পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত একটি ইলেকট্রন যাতে আছে অতিক্ষুদ্র পরিমাণে ঋণাত্মক চার্জ। আবার সালফেট আয়নকে বলা যায় একটি সালফার পরমাণু ও চারটি অক্সিজেন পরমাণু জোটের সঙ্গে যুক্ত দুটি ইলেকট্রন। অর্থাৎ তাঁর ঋণাত্মক আধানযুক্ত আয়নের ধারণাকে এবার ইলেকট্রনের ধারণায় প্রকাশ করা সম্ভব হল। কিন্তু ধনাত্মক আধানযুক্ত আয়নের ব্যাখ্যা কি হবে? যেমন সোডিয়াম আয়নকে এভাবে ব্যাখ্যা করলে বলতে হয় সোডিয়াম পরমাণু ও তার সাথে যুক্ত কোনো ধণাত্মক আধান। কিন্তু ইলেট্রনের মতো কোনো ঋণাত্মক চার্জ সম্পন্ন কণার সন্ধান পাওয়া না যাওয়ায় এমন ব্যাখ্যা করা সম্ভব হচ্ছিল না। একটা ধারণা তৈরি হয়েছিল যে ধনাত্মক চার্জ তৈরি হতে পারে, যদি কোনো বস্তু থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয়ে যায়। এই বৈপ্লবিক সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল জার্মান বিজ্ঞানী হারটজ্ (Hertz) এর রেডিও তরঙ্গ নিয়ে পরীক্ষাকালীন।

হারটজ্ যে পরীক্ষাটি করেছিলেন সেখানে ক্যাথোড পাতের উপর অতিবেগুনী রশ্মি ফেললে তার থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয় (এমনটা নিশ্চিত করেছিলেন তাঁরই সহকারী লেনার্ড)। অর্থাৎ আলোক শক্তির প্রয়োগে বিদ্যুতের প্রবাহ হচ্ছে। লেনার্ডের ধারণা ছিল যে পরমাণু সাধারণ অবস্থায় নিস্তরিৎ। কারণ তাতে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক কণা সমানভাবে আছে। কিন্তু ইলেকট্রনের মতো ধনাত্মক চার্জ কেন পরমাণু থেকে নির্গত হয় না। এর জবাবে বিজ্ঞানী থমসন (যিনি ইলেকট্রনের আবিষ্কর্তা) বললেন যে পরমানুর মধ্যে ইলেকট্রন অনেকটা তরমুজের বিচি বা পুডিং এর কিসমিসের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যারা ঋণাত্মক চার্জ সম্পন্ন। আর বাকি পরমাণু ধনাত্মক চার্জ সম্পন্ন। এরা সমপরিমাণের হওয়ায় পরমাণু নিস্তরিৎ। কিন্তু পরমাণুর এই মডেল শক্ত ভিতের উপর দাঁড়ালো না। কারণ ইতিমধ্যে বিজ্ঞানী গোল্ডস্টেইন (১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে) এমন একটি ক্যাথোড রশ্মি নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন, যেখানে ক্যাথোড পাতটি ছিল ছিদ্রযুক্ত। যখন ক্যাথোড থেকে ক্যাথোড রশ্মি নির্গত হত (তখনো তা ইলেকট্রন স্রোত বলে জানা ছিল না) তার ঠিক বিপরীতে আরেক রকম রশ্মি বিকিরণ এই পরীক্ষায় চিহ্নিত হল। যেহেতু ঋণাত্মক চার্জযুক্ত ক্যাথোড রশ্মির বিপরীতে ধনাত্মক চার্জযুক্ত রশ্মি বিকিরণ হচ্ছে, তাই ইলেকট্রন আবিষ্কর্তা বিজ্ঞানী জে. জে. থমসন ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে এর নামকরণ করেন 'ধনাত্মক রশ্মি' (positive rays) বলে।

এই পরীক্ষা থেকে জানা গেল ক্যাথোড রশ্মির বিপরীতে যে ধনাত্মক আধানের স্রোত পাওয়া গেল তাও কণা হোক বা তরঙ্গ, তা সরলরেখায় চলে। কিন্তু তার গতিবেগ ইলেকট্রনের থেকে কম। এর গতিপথে কোনো অস্বচ্ছ বস্তু রাখলে তার পিছনে ছায়া পড়ে। এটিও তড়িৎ ক্ষেত্র বা চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়। সমান প্রাবল্যে তড়িৎ ক্ষেত্র বা চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা এই রশ্মি একই রকম বিক্ষিপ্ত হলেও এর বিক্ষেপণ কম। এর গতিপথে পাখাযুক্ত হাল্কা চাকা রাখলে ঘুরতে থাকে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে বলা যায় এটি ধনাত্মক চার্জযুক্ত ইলেকট্রনের থেকে ভারি কণার স্রোত।

ইলেকট্রনের আধান বা চার্জ যা পাওয়া গেছিল, এক্ষেত্রেও তাই পাওয়া গেল (যদিও এর চার্জ বিপরীত), অর্থাৎ

1.602×10^{-19} কুলম্ব। এর চার্জ ও ভরের অনুপাত পাওয়া গেল অনেক কম (অর্থাৎ 9.579×10^{4} কুলম্ব/গ্রাম)। সুতরাং এই দুটি মান থেকে একটি ধনাত্মক চার্জের ভর পাওয়া গেল

$$\frac{1\cdot602\times10^{-19}\text{ কুলম্ব}}{9\cdot579\times10^{4}\text{কুলম্ব/গ্রাম}}=1\cdot672\times10^{-24}\text{ গ্রাম}$$

অর্থাৎ যেখানে পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্রতম কণা ইলেকট্রন একটি সবথেকে হাল্কা পরমাণু হাইড্রোজেনের ভরের ১/১৮৩৭ মাত্র, সেখানে একটি নতুন আবিষ্কৃত ধনাত্মক চার্জযুক্ত কণার ভর হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রায় সমান। অবশেষে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে নিউজিল্যান্ডের বিজ্ঞানী আর্নেস্ট রাদারফোর্ড সিদ্ধান্তে আসেন যে এই ধনাত্মক চার্জ হল ইলেকট্রনের মতো এক প্রকার কণা। এই কণার নামকরণ করেন (১৯২০ খ্রিস্টাব্দে) প্রোটন।

বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড এই সিদ্ধান্তে আসার আগে ক্রমাগত পরমাণুর অভ্যন্তরীণ গঠন জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে তেজস্ক্রিয় রশ্মি দিয়ে তার উপর আঘাত হানছিলেন। তিনি এই প্রয়াস শুরু করেন ১৯০৬ থেকে। তেজস্ক্রিয় মৌলগুলির আবিষ্কারের পর থেকে এই মৌলগুলি থেকে নির্গত বিকিরণ প্রসঙ্গে বিজ্ঞানীরা, বিশেষ করে রাদারফোর্ড আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কারণ তাঁদের ধারণা ছিল এই বিকিরণ (এমনকী এক্স রশ্মিও) অধিক কর্মশক্তিপূর্ণ (energetic)। এদের চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করলে কিছু ক্ষেত্রে তীব্র বিক্ষেপণ হয় বিপরীত দিকে। রাদারফোর্ড এক্স রশ্মি ছাড়া প্রাপ্ত অন্য তিন রকম বিকিরণের নামকরণ করেন আলফা (α) রশ্মি, বিটা (β) রশ্মি এবং গামা (γ) রশ্মি হিসেবে। এগুলো সবই ছিল গ্রিক বর্ণমালা থেকে সংগৃহীত।

যেহেতু গামা (γ) রশ্মি চৌম্বকক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত হয় না, তাই তাঁর মনে হল এটি দৃশ্যমান আলোর মতো, অনেকটা এক্স রশ্মির মতো, তবে অধিক শক্তিশালী। বিটা (β) রশ্মি ক্যাথোড রশ্মির মতো একই দিকে এবং একই পরিমাণে বিক্ষিপ্ত হয়। আলফা (α) বিক্ষেপণ চৌম্বক ক্ষেত্রে দেখা গেল বিটা (β) রশ্মির বিপরীতে। এর বিক্ষেপণ অপেক্ষাকৃত কম, অর্থাৎ এর ভর অনেক বেশি। হিসেব করে দেখা গেল এই রশ্মি এমন কণার স্রোত যাতে রয়েছে চারটি করে প্রোটন কণা ও দুটি করে ইলেকট্রন কণা। প্রায় তিরিশ বছর ধরে আলফা (α) কণার গঠন সম্পর্কে এই ধারণাই বলবৎ ছিল (১৯৩২ পর্যন্ত, পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ নিউট্রন কণার আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত)। নিউট্রন আবিষ্কারের পরে জানা গেছিল কেন কিছু মৌলে তেজস্ক্রিয়তার ধর্ম লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে আমরা পরে সেই সময়কার আলোচনায় চর্চা করবো।

ইউরেনিয়াম বা থোরিয়াম মৌল থেকে প্রাপ্ত বিকিরণ (তেজস্ক্রিয়) খুবই ক্ষীণ এবং তাকে কাজে লাগানো সহজসাধ্য ছিল না। এই অবস্থাকে ঠিকঠাক করেন যিনি, তিনি মাদাম ক্যুরি। তাঁর মনে হল তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়ামের খনিজে অবশ্যই অন্য তেজস্ক্রিয় মৌল রয়েছে। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি এবং তাঁর স্বামী পিয়ের ক্যুরি এই বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে নতুন তেজস্ক্রিয় মৌলের সন্ধান পান। সেগুলি যথাক্রমে পোলোনিয়াম (তাঁর মাতৃভূমি পোল্যান্ডকে স্মরণ করে এই নামকরণ) এবং রেডিয়াম। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ফরাসী রসায়ন বিজ্ঞানী অ্যান্দ্রেক লুইস ডেবিয়ার্নে আবিষ্কার করলেন আরেকটি তেজস্ক্রিয় মৌল অ্যাকটিনিয়াম। এরপরেও আরো কয়েকটি তেজস্ক্রিয় মৌল আবিষ্কার হয়েছে। একদিকে তেজস্ক্রিয় মৌলের আবিষ্কার, অন্যদিকে তা থেকে প্রাপ্ত তেজস্ক্রিয় বিকিরণ (যা দেখা যাচ্ছিল তীব্র গতি সম্পন্ন ক্ষুদ্র এক বা একাধিক কণার স্রোত)-কে বন্দুকের গুলির মতো ব্যবহারের চিন্তা সর্বপ্রথম করলেন রাদারফোর্ড। ১৯০৬-এর শুরুর দিকে তিনি সোনার খুব পাতলা পাতের উপর এই তেজস্ক্রিয় রশ্মির আঘাত হানলেন। তাঁর কাছে সোনার থেকে পাতলা ধাতুর পাত ছিল না, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যত কম পরমাণুর স্তরের মধ্যদিয়ে এই রশ্মিকে পার করানো যায়। সোনার পাতের বেধ (thickness) ছিল পরপর সাজানো দু'হাজারটি পরমাণুর সমান (অর্থাৎ সাধ্যমত সর্বাধিক পাতলা)। যদিও কিছু আলফা (α) কণা ভয়ানক বিক্ষিপ্ত হল, তবু অধিকাংশই বিনা বাধায় সোজাসুজি নির্গত হল। এখান থেকে তিনি অনুমান করলেন যে পরমাণুতে এমন খুব অল্প স্থান আছে যেখানে প্রচুর ভর জমা আছে এবং তা ধনাত্মক চার্জ যুক্ত। কারণ আলফা কণা ধনাত্মক চার্জ যুক্ত (এই সময় ধারণা ছিল প্রতিটি আলফা কণা গড়ে উঠেছে চারটি করে প্রোটন এবং দুটি করে ইলেকট্রন দ্বারা। অর্থাৎ সামগ্রিক অর্থে এর প্রতিটি কণা ধনাত্মক চার্জ যুক্ত। এই ধারণা সম্পূর্ণ সঠিক না হলেও আলফা কণা ধনাত্মক চার্জের, এই ধারণা সঠিক ছিল) হওয়ায় পরমাণুর অভ্যন্তরে ক্ষুদ্রস্থানে থাকা প্রোটন দ্বারা তা বিকর্শিত হয়ে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। কিন্তু পরমাণুর অধিকাংশটাই ফাঁকা থাকায়, অধিকাংশ আলফা কণা বিনা বাধায় সোজা পথে নির্গত হচ্ছে।

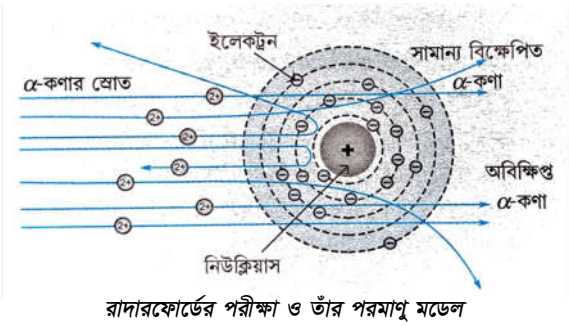

রাদারফোর্ডের পরীক্ষা ও তাঁর পরমাণু মডেল

এই পরীক্ষা লব্ধ ফলাফল থেকে রাদারফোর্ড পরমাণুর নতুন এক মডেলের ধারণা দিলেন। তাঁর মতে পরমাণুর কেন্দ্রে আছে অতিক্ষুদ্র নিউক্লিয়াস, যা ধনাত্মক চার্জ সম্পন্ন। এতে আছে প্রোটনগুলি। এর বাইরের অংশে আছে ঋণাত্মক চার্জ সম্পন্ন ইলেকট্রনগুলি। রাদারফোর্ডের এই মডেল ছিল দ্বিমাত্রিক বৃত্তাকার। এই বৃত্তের কেন্দ্রে নিউক্লিয়াসের অবস্থান। যেকোনো রাসায়নিক বিক্রিয়াকালে এখানে কোনো হাত পড়ে না। পরমাণুতে রাসায়নিক বিক্রিয়াকালে কেবলমাত্র একটাই পরিবর্তন হয়, সেটা হয় নিউক্লিয়াসকে ঘিরে বৃত্তাকার পথে আবর্তনরত ইলেকট্রনের বহিঃস্থ কক্ষপথে। এখানে হয় বাইরে থেকে ইলেকট্রন এসে হাজির হয়, নয় তা থেকে তা নির্গত হয়। ইলেকট্রনের অন্যান্য কক্ষপথে তারা অক্ষত থেকে যায়। এই যে ইলেকট্রনের বিযুক্তি কিংবা সংযুক্তি – এই ব্যাখ্যা নিস্তরিং পরমাণু থেকে আয়ন তৈরিকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হল। শুধুমাত্র ঋণাত্মক চার্জ যুক্ত আয়ন নয়, পরমাণুর বাইরের কক্ষপথ থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয়ে যে ধনাত্মক চার্জ যুক্ত আয়ন গড়ে তোলা সম্ভব, তাও মেনে নেওয়া সম্ভব হল। ফলশ্রুতিতে আরহেনিয়াসের আয়নীয় তত্ত্ব গ্রাহ্যতা পেতে অসুবিধা রইলো না।

ডালটনের সময়কালে ধারণা ছিল যে বিভিন্ন মৌলের পরমাণুর ভর বিভিন্ন কিন্তু তা কিভাবে হয় তার ব্যাখ্যা ছিল না। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী ম্যাক্স থিওডর ফেলিক্স ভন লাউই একটি কেলাসকে এক্স রশ্মি দ্বারা আঘাত করলেন। ধারণায় ছিল যে কেলাসে উপস্থিত পরমাণুগুলির গঠন (Structure) জ্যামিতিকভাবে নিয়তাকার (geometric structure of regular layers) এই রকম আকারের কারণে এক্স রশ্মির বিচ্ছুরণ হবে একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্নে। এই বিচ্ছুরণজনিত যে ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য উপলব্ধ হবে, তাকে খুঁজে বার করাই ছিল এই পরীক্ষার লক্ষ্য। এরপর একই ধরনের পরীক্ষা চালান ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ বিজ্ঞানী চার্লস গ্লোভার বার্কলা এবং ইংরেজ পদার্থবিজ্ঞানী হেনরি জিয়ান-জেফরেস মোসলি [Henry Gwyn-Jeffreys Moseley]। মোসলি ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কার করেন যে এক্সরশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমছে পরমাণুর পারমাণবিক গুরুত্বের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। এই ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক থেকে মোসলি ধারণা করেন যে এটি হচ্ছে পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ ধনাত্মক চার্জ বা প্রোটনের কারণে। কারণ তখনো পর্যন্ত পরীক্ষালব্ধ ফল থেকে জানা গেছিল যে পরমাণুর অভ্যন্তরে থাকা ইলেকট্রনের ভর নগণ্য। তার ভর মূলত প্রোটনের ভর। ধনাত্মক চার্জের পরিমাণ বৃদ্ধি (অর্থাৎ প্রোটনের সংখ্যা বৃদ্ধি), বিচ্ছুরণ থেকে প্রাপ্ত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের হ্রাসের কারণ।

এই তরঙ্গদৈর্ঘ্য থেকে ধারণা করলেন হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়ার চার্জ +1, হিলিয়ামের +2, লিথিয়ামের +3 এবং এমন আরো যা +92 হবে ইউরেনিয়ামের জন্য। এই প্রাপ্ত নিউক্লিয়ার চার্জকে বলা হল পারমাণবিক সংখ্যা (atomic number)। **এই প্রথম বোঝা গেল যে মেন্ডেলিফ যে পারমাণবিক গুরুত্ব অনুসারে পর্যায় সারণীকে সাজিয়েছিলেন তা আসলে পারমাণবিক সংখ্যা অনুসারেই মূলত সাজানো।** ডালটনের পরমাণুবাদে বিভিন্ন মৌলের ভরের পার্থক্য এবার স্পষ্ট হল প্রতিটি মৌলের পারমাণবিক মডেল থেকে (রাদারফোর্ডের মডেল থেকে)

1	2											3	4	5	6	7	0
							H										He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra	Ac															

১৯১৩ খ্রিঃ হেনরি মোসলি কর্তৃক সংশোধিত পর্যায় সারণী

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে হেনরি মোসলি পরমাণুর ধনাত্মক চার্জ অর্থাৎ প্রোটন সংখ্যা অর্থাৎ পারমাণবিক সংখ্যার ভিত্তিতে মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণীকে আধুনিক রূপ দিলেন। তাঁর এই পর্যায় সারণীতে বোঝা যায় আয়োডিন (I) এর পরমাণুর ইলেকট্রনের সর্ববহিঃস্থ কক্ষপথে সাতটি ইলেকট্রন থাকায় তা সপ্তম গ্রুপে অবস্থিত। যেখানে ঐ গ্রুপে উপস্থিত অন্যান্য মৌলগুলির পরমাণুর গঠন পর্যবেক্ষণ করলেও সর্ববহিঃস্থ কক্ষপথে সাতটি করেই ইলেকট্রন পাওয়া যাবে। অর্থাৎ এই গ্রুপের প্রতিটি মৌলই একটি করে ইলেকট্রনের প্রত্যাশী। টেলুরিয়ামের ক্ষেত্রেও একই ধরনের কথা বলা চলে।

নতুন এই পর্যায় সারণীতে শূন্য (০) গ্রুপটি মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণীতে ছিল না, যারা নিষ্ক্রিয়। অর্থাৎ অন্যদের সঙ্গে

শেষাংশ ৩৯ পৃষ্ঠায় দেখুন ➔

সমাজ দর্পণ ঃ

দাভোলকর হত্যার রায়

বিগত ১০ই মে পুণের একটি বিশেষ সিবিআই আদালত নরেন্দ্র দাভোলকর হত্যা মামলায় অভিযুক্ত শচীন প্রকাশ রাও আন্দুরে এবং শারদ ভৌসাহেব কালস্কর'কে যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং ৫ লক্ষ টাকা করে জরিমানা ঘোষণা করেছে। তবে অন্য তিন অভিযুক্ত – মাস্টারমাইন্ড বীরেন্দ্র সিং শরদচন্দ্র তাওয়াদে, আইনজীবী সঞ্জীব পুনালেকার এবং তার সহকারী বিনয় ডাভে'কে "প্রমাণের অভাবে" ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সংবাদপত্র দ্য হিন্দুতে বলা হয়েছে যে মহারাষ্ট্র পুলিশ এবং সিবিআই উভয়ের যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহের ব্যর্থতার কারণে এরা ছাড় পেয়ে গেল। এবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থেকেই যায়, পুলিশ এবং সিবিআই কি মাস্টারমাইন্ডকে শাস্তি দানের জন্য আদৌ যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করেছে?

অতিরিক্ত দায়রা বিচারক প্রভাকর পি যাদবের পর্যবেক্ষণ ছিল – 'অপরাধের মূল পরিকল্পনাকারী অন্য কেউ।' যে দুজনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড হয়েছে তাদের মধ্যে শচীন প্রকাশ রাও আন্দুরে একজন দোকান কর্মচারী এবং শারদ কালস্কর একজন কৃষক। তাই সমস্ত সংবাদ দৃষ্টে বলা যায় আজ থেকে এগারো বছর আগে কুসংস্কার বিরোধী ক্রুসেডার নরেন্দ্র দাভোলকরের হত্যার বিচার আজও হয়নি। মাস্টারমাইন্ডের শাস্তি হয়নি। বিচারবিভাগ সহ রাষ্ট্রের এটা জানা আছে এই হত্যার মাস্টারমাইন্ড কে ছিলেন। তা সত্ত্বেও তথাকথিত "প্রমাণের অভাবে" আইনের ফাঁক দিয়ে তাকে ছাড় দেওয়া হয়েছে।■

সেমিনার

"মহাবিশ্বের সৃষ্টি থেকে পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি"

স্থান ঃ রামকিঙ্কর সভাগৃহ (তথ্যকেন্দ্র)
শিলিগুড়ি (কোর্ট মোড়ের কাছে)
সময় ঃ ৭ই জুলাই ২০২৪ (২২শে আষাঢ় ১৪৩১) রবিবার
বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা
আয়োজক ঃ বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ (শিলিগুড়ি শাখা)

ঃ যোগাযোগ ঃ

দীপিকা রুদ্র (৯৪৩৪৮১১৩২৬/৯৫৯৩৬৭৩২৯০)
গুরুদাস দাস (৯৪৩৪১৫১৯৮০/৭০৩১০৫২২৭৫)

বিজ্ঞানের খবর

ফেব্রুয়ারি ঃ ৬. ●মেক্সিকো উপসাগরীয় অঞ্চলের আলাবামা উপকূল সন্নিকটে এক ধরনের শম্বুক প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন এই প্রজাতির শামুকের সন্ধান কেউ আগে পাননি। মুসেল প্রজাতির শামুকটির নাম ***ভাদুমোদিওলাস টেরিডিনিকোলা।*** (নিউ ইয়র্ক টাইমস)

●অন্যদিকে জাপানের মেরিন-আর্থ সায়েন্স টেকনোলজি বিভাগের একদল বিজ্ঞানী জানাচ্ছেন যে তাঁরা এক নতুন প্রজাতির জেলিফিস আবিষ্কার করেছেন। ছাতার আকৃতি জেলিফিসটি পাওয়া গেছে ওগাসাওয়ারা দ্বীপপুঞ্জের নিকট ২৬৬৪ ফুট গভীরে। ***স্যান্টিওর্ডিয়া পাগেসি*** নামক এই প্রজাতির জেলিফিস শরীর থেকে যে বিষাক্ত পদার্থ নির্গত করে তা অন্য প্রজাতির দেহে শুধু অনুপস্থিত থাকে তা নয়, বিষের রাসায়নিক গঠন ও ধর্ম একেবারে অভিনব। এই বিষয়ে গবেষণা চলছে। (নিউজ উইক)

৭. ●পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব হয়েছে মহাজাগতিক ধূলিকণা থেকে – এই প্রকল্পটিকে বলা হয় 'প্যান্সপার্মিয়া'। জর্জিয়ার টিবিলিসি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক বিজ্ঞানী এন. ওসমানভ সম্প্রতি এই প্রকল্পের সপক্ষে বহু গণিত নির্ভর যুক্তি হাজির করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে বা এক ছায়াপথ থেকে অন্য ছায়াপথে কিভাবে প্রাণের বিস্তার ঘটতে পারে। এমনকি কি গতিতে বিস্তার ঘটতে পারে তা তিনি হিসাব করেছেন। যদিও এটি গবেষণাপত্র হিসাবে এখনো প্রকাশিত হয়নি। (সায়েন্স এলার্ট)

●চীনের বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, তাঁরা লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারীর বিকল্প তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। নতুন ধরনের ব্যাটারীতে ব্যবহার করা হয়েছে ক্যালসিয়াম। প্রকৃতিতে যার প্রাচুর্য্যতা লিথিয়ামের তুলনায় ২৫০০ গুণ বেশি। শুধু তাই নয়, পৃথিবীতে লিথিয়ামের ভান্ডার খুব দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে ও লিথিয়ামের নিষ্কাশন পদ্ধতি খুব খরচ সাপেক্ষ বলে বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন। এই ক্যালসিয়াম-অক্সিজেন সেল হবে খুব সস্তা যা ঘরের তাপমাত্রায় ৭০০ বার রিচার্জ-ডিসচার্জ করা সম্ভব হয়েছে। (নেচার)

১২. ●নাসা ও জার্মান এরোস্পেস সেন্টারের যৌথ প্রচেষ্টায় এই প্রথমবার দুটি গ্রহাণুর উপরিতলে জলের সন্ধান পেলেন বিজ্ঞানীরা। আইরিস ও মাসালিয়া নামের সিলিকেট প্রধান গ্রহাণু দুটিকে ইনফ্রায়েড অ্যাস্ট্রোনমি প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এই পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত ডেটা বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। (স্পেস ডট কম)

১৪. ●জীবাশ্ম জ্বালানী থেকে পুনর্নবীকরণযোগ্য বা সবুজ শক্তিতে উত্তরণের ঢল নেমেছে বিশ্বময়। কিন্তু এই উত্তরণ বাস্তবায়নের প্রকৃত চিত্রটা কেমন? সম্প্রতি নরওয়ের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সংস্থার একটি সমীক্ষায় জানা গেছে সারা বিশ্বের ১৯৬টি দেশের ১৮৪০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ৬১৪২টিতে শক্তি বিষয়ক পাঠদান করা হয়। এর মধ্যে মাত্র ৫৪৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবাশ্ম জ্বালানী-শক্তি বিষয়ক ডিগ্রি প্রদান করা হয় ও পাঠ্যক্রমে কেবলমাত্র দুই ধরনের শক্তির তুলনামূলক শিক্ষা দেওয়া হয়। মাত্র ২৪৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সবুজ জ্বালানী সংক্রান্ত ডিগ্রি প্রদান করা হয় যারা এই উত্তরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। এর মধ্যে আবার সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হাতে গোনা, বেসরকারী উদ্যোগই প্রধান। সমীক্ষার ফলাফলে সমীক্ষকেরা আক্ষেপ করে বলেছেন এটা খুবই হতাশাজনক, সরকারী প্রতিষ্ঠানের এই অনীহা পুরোপুরি রাজনৈতিক যা আগামীদিনে বিপদ ডেকে আনবে। (ইউনিভার্সিটি ওয়ার্ড নিউজ)

১৯. ●মহাকাশ বিজ্ঞানীরা উজ্জ্বলতম ও অতিদ্রুত বর্ধনশীল কোয়াসারের সন্ধান পেলেন। পৃথিবী থেকে ১২০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে পিকটর নামক নক্ষত্রপুঞ্জে কোয়াসারটির অবস্থান। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন নক্ষত্রপুঞ্জটির শক্তির উৎস হল অতিবৃহদাকৃতি কৃষ্ণগহ্বর। ঐ কৃষ্ণগহ্বরে প্রতিদিন সূর্যের সমপরিমাণ ভরের বৃদ্ধি ঘটছে। (ইউরোপিয়ান সাদার্ন অবজারভেটরী)

২৩. ●মহাবিশ্বের চারটি মৌলিক বলের মধ্যে তড়িতচুম্বকীয় বল, শক্তিশালী নিউক্লীয় বল ও দুর্বল নিউক্লীয় বলকে কোয়ান্টাম তত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হলেও, চতুর্থ বল অর্থাৎ মহাকর্ষ বলের ক্ষেত্রেই তা সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি, সাদার্ম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা মহাকর্ষীয় বলকে আণুবীক্ষণিক স্তরে পরিমাপ করতে সক্ষম হয়েছেন যার থেকে কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটির ধারণার জন্ম নিয়েছে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এই তত্ত্ব আগামীদিনে মহাবিশ্বের বিশেষতঃ কৃষ্ণগহ্বরের বহু রহস্যের সমাধান করতে সাহায্য করবে। (স্পেস ডট কম)

২৬. ●বর্তমান পৃথিবীতে মানুষের শারীরিক স্থূলতা মহামারীর আকার নিয়েছে। এই সমস্যা সমাধানের পথে বিজ্ঞানীরা আরও কিছুটা এগিয়েছেন। অন্ত্রে উপস্থিত যে সমস্ত ব্যাক্টিরিয়া বিপাকে অংশগ্রহণ করে তার কর্মক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করে ও রেসিস্ট্যান্স স্টার্চ ব্যবহার করে বিজ্ঞানীর ৮ সপ্তাহে গড়ে ২.৮ কেজি ওজন হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছেন। (নেচার মেটাবলিজম)

২৮. ●মানুষের পূর্বপুরুষদের লেজ ছিল শরীরের অন্যতম প্রধান কার্যকরী অঙ্গ। কিন্তু কেন তা আজ আমাদের হারাতে হল সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন একাধিক কারণ। গবেষকরা জানিয়েছেন গাছ থেকে পুরোপুরি মাটিতে নেমে আসার ঘটনা থেকেই লেজমুক্তির সূত্রপাত। এরপর দুপায়ে সোজা হয়ে হাঁটার প্রয়োজনীয়তা লেজের গুরুত্বকে হ্রাস করে। এই কারণগুলির পাশাপাশি জিনগত কারণও থাকতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। ইঁদুরের উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে ইঁদুরের লেজ খসে যাওয়ার জন্য প্রায় ১০০টি জিন দায়ী। মানুষের ক্ষেত্রেও ইতিমধ্যে বিজ্ঞানীরা কিছু জিন সনাক্ত করেছেন। মনে করা হচ্ছে বিবর্তন প্রক্রিয়ার সঙ্গে ঐ জিন যুক্ত থাকতে পারে। গবেষণা চলছে। (নেচার)

মার্চ ঃ ৪. ●মহাকাশ বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন বৃহস্পতির চাঁদ 'ইউরোপা'-য় অক্সিজেনের পরিমাণ পূর্বের ধারণার চেয়ে কম। সাম্প্রতিক গবেষণালব্ধ পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা ধারণা পোষণ করেছেন যে বৃহস্পতির ঐ উপগ্রহটিতে প্রাণ ধারণের পরিবেশ ততটা উপযুক্ত নয়। (নিউ ইয়র্ক টাইমস)

●পৃথিবীতে প্রাণের, উৎপত্তি সংক্রান্ত অনেক তত্ত্ব ও প্রকল্প আছে। তার মধ্যে অন্যতম হল 'আরএনএ ওয়ার্ল্ড' প্রকল্প। এই প্রকল্প অনুযায়ী আরএনএ অণুর হাত ধরেই পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব হয়েছে। সম্প্রতি চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের একদল বিজ্ঞানী এক ধরনের আরএনএ অণু তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন যা শুধু নিজের প্রতিলিপি তৈরী করতে পারে তাই নয়, যার মধ্যে অণুঘটক ধর্মের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই ঘটনাকে বিজ্ঞানীরা বৈপ্লবিক আখ্যা দিয়েছেন ও আরএনএ ওয়ার্ল্ড তত্ত্বের কার্যকারীতার সপক্ষে বক্তব্য রেখেছেন। (ওয়াশিংটন পোস্ট)

৬. ●আমেরিকার কোম্পানী কলোজাল বায়োসায়েন্স-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে বিজ্ঞানীরা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া এশিয়ান হাতির স্টেম সেল বানাতে সক্ষম হয়েছেন। এর ফলে জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে লোমশ ম্যামথ ক্লোন করা সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঐ প্রজাতির হাতিটি প্রায় হাজার বছরআগে বিলুপ্ত হয়েছে। (এনপিআর)

১২. ●পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহের মধ্যকার দূরত্ব ন্যূনতম ৫.৫ কোটি ও সর্বোচ্চ ৪০ কোটি কিমি হতে পারে। পৃথিবীতে এই দূরত্বের তারতম্য জনিত প্রভাব কি হতে পারে তা সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার সিডনী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতাত্ত্বিকরা আবিষ্কার করেছেন। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে এই চক্র সম্পূর্ণ হতে ২৪ লক্ষ বছর সময় লাগে এবং তার প্রভাব পড়ে পৃথিবীর সমুদ্রের সুগভীর তলদেশে। গভীর সমুদ্রের জলস্রোত ও পলি সঞ্চয়ের উত্থান-পতনের সঙ্গে এই চক্রের সম্পর্ক বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন। এই ঘটনার সঙ্গে সৌরশক্তির ওঠানামার সম্পর্কটিও বিজ্ঞানীদের মধ্যে কৌতুহল সৃষ্টি করেছে। (নেচার কমিউনিকেশন)

১৩. ●ইউরোপীয় ইউনিয়নের সংসদ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আইন পাশ করল যা আগামী মে মাস থেকে কার্যকরী হতে চলেছে। সাংসদদের মধ্যে ৫২৩ জন পক্ষে, ৪৬ জন বিপক্ষে ভোটদান করেন ও ৪৯ জন ভোটদানে বিরত থাকেন। পৃথিবীতে এই প্রথম এমন আইন জারী হল। অনেকেই মনে করছেন এই আইন বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করবে ও খুব দ্রুত সেকেলে হয়ে যাবে। (সিএনবিসি)

●আমেরিকা জানিয়েছে যে ঐ দেশে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনে যে পরিমাণ মিথেন নির্গত হয় তা পূর্বের ধারণার তুলনায় প্রায় তিন গুণ। জমি খনন ও ভরাট, কৃষিকর্ম, খনি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বায়ুমন্ডলে মিথেন নিষ্কাশনের হিসাব থাকলেও তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনে মিথেন নিষ্কাশনের কোন সরকারী তথ্য ছিল না। জানানো হয়েছে যেহেতু কার্বন-ডাই-অক্সাইডের তুলনায় মিথেনের আয়ুষ্কাল খুব কম তাই মিথেন নিষ্কাশন রোধ করা কার্বন-ডাই-অক্সাইডের তুলনায় অনেক সহজ। তাই প্রকৃতি থেকে মিথেন দূরীকরণের কর্মসূচী অতি দ্রুত গ্রহণ করা উচিৎ। (এবিসি নিউজ)

১৯. ●মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের কার্যাবলীকে অনুধাবন করার লক্ষ্যে রোড দ্বীপের ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এক অভিনব প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন। **বিজ্ঞানীরা প্রায় ৭৮টি অতিক্ষুদ্র আকারের লবণের দানার আকারের সেনসরকে নিউরনের মধ্যে প্রতিস্থাপিত করতে সক্ষম হয়েছেন। সেই নিউরনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তথ্যাবলী সংগ্রহ, প্রেরণ ও তার অর্থ পুনরুদ্ধার (ডিকোড) করতে সক্ষম হয়েছেন।** এই উদ্ভাবন আগামীদিনে স্নায়ুপ্রযুক্তির বিকাশের ক্ষেত্রেই এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা প্রকাশ করেছেন। (ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় ও চেনার ইলেক্ট্রনিকস)

২০. ●আর্মস্টাডাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জিন বিজ্ঞানীরা CRISPR প্রযুক্তি লাগিয়ে HIV আক্রান্ত রোগীর শরীর থেকে ভাইরাস মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। তবে এতে সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্তি ঘটবে কিনা সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা সন্দিহান। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন সম্পূর্ণ রোগমুক্তি না ঘটলেও এই গবেষণা ভাইরাসকে বহুলাংশে নিষ্ক্রিয় করতে সক্ষম হয়েছে যা আগামীদিনে এই রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রেই কার্যকরী ভূমিকা নেবে। (বিবিসি নিউজ)

●মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল লাইব্রেরী অব মেডিসিন, জুনোটিক অতিমারীকে প্রতিহত করতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে অতিমারী প্রতিরোধের মূল তিনটি দিক আছে, ১) সংক্রমণ প্রতিরোধ, ২) প্রস্তুতি ও ৩) সংক্রমণ পরবর্তী তৎপরতা। এর মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিষয়ে মোটামুটি দক্ষতা গড়ে উঠলেও প্রথম বিষয়ে অর্থাৎ পশু থেকে মানুষের সংক্রমণের বিষয়ে মনযোগ দিতে হবে। সংস্থার পক্ষ থেকে এই বিষয়ে একটি রোড ম্যাপ তৈরী করেছে। (নেচার কম্যুনিকেশন)

২৭. ●ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপ এর একদল বিজ্ঞানী জানিয়েছেন, যে তাঁরা আকাশ গঙ্গা ছায়াপথের কেন্দ্রে স্যাগ্‌িটেরিয়াস এ* নামক কৃষ্ণগহ্বরে শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের সন্ধান পেয়েছেন। তাঁরা দানবাকৃতি কৃষ্ণগহ্বরের কিনার থেকে সর্পিলাকার সমাবর্তিত আলোর ছটা লক্ষ্য করেন যা পূর্বে এম৮৭* কৃষ্ণগহ্বরেও দেখা গেছে। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন এই ধর্ম সম্ভবতঃ সকল কৃষ্ণগহ্বরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। (ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপ কোলাবোরেশন)

এপ্রিল ঃ ১. ●অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী (রেসিস্ট্যান্ট) ব্যাকটেরিয়ার মোকাবিলা বা নিয়ন্ত্রণ চিকিৎসা শাস্ত্রের কাছে এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। উপশালা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এক বিশেষ শ্রেণীর অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার করেছেন যা মাল্টি-ড্রাগ প্রতিরোধী গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করতে সক্ষম। ইঁদুরের উপর পরীক্ষা করে বিজ্ঞানী দেখেছেন যে আবিষ্কৃত অ্যান্টিবায়োটিকটি একটি বিশেষ প্রোটিনের উপর ক্রিয়া করে ও রক্তের সংক্রমণকে সারিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। মানুষের উপর তার কার্যকারীতা নিয়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন। (উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়)

৪. ●'নেচার' পত্রিকার পক্ষ থেকে এক সমীক্ষায় জানানো হয়েছে যে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিষ্কাশনের বৃদ্ধি ঘটেছে মাত্র ০.১ শতাংশ। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে বাতাসে ঐ গ্যাসের মোট পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৫.৮ গিগাটন। ঐ সংস্থার সমীক্ষা অনুযায়ী ২০২১ খ্রিস্টাব্দে নিষ্কাশনের বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৫.৪% ও ২০২২ খ্রিস্টাব্দে এর পরিমাণ ছিল ১.৯%। (নেচার)

১২. ●টার্ডিগ্রেডস বা জলভল্লুক হল এক ধরনের আণুবীক্ষণিক প্রাণী যার মৃত্যু নেই। প্রবল চাপ, তাপ এমনকি ক্ষতিকারক বিকিরণও সে হেলায় সহ্য করতে পারে। যে পরিমাণ বিকিরণে মানুষের মৃত্যু হয় তার ১৪০০ গুণ বিকিরণ সহ্য করতে সক্ষম এক বিশেষ প্রজাতির জলভল্লুক। ইদানীং, একদল বিজ্ঞানী এই অমরত্বের রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন। তাঁরা দেখেছেন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তথা বিকিরণের ফলে ঐ প্রাণীর শরীরের ডিএনএ অণুগুলির চরম ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অতিদ্রুত তা সারিয়ে ফেলতে সক্ষম। এ যেন কল্পবিজ্ঞানের গল্প। এই ক্ষমতা অন্য কোন প্রাণীর আছে কিনা তা বিজ্ঞানীদের জানা নেই। (নিউ ইয়র্ক টাইমস)

১৬. ●রিকেন সংস্থার বিজ্ঞানীরা লেজার পালস-এর শক্তি ৫০ গুণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। এই উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে অ্যাটোসেকেন্ড ($১০^{-১৮}$ সেকেন্ড) লেজারের যুগ অতিক্রম করে তা জেপ্টোসেকেন্ড ($১০^{-২১}$ সেকেন্ড)-এর দিকে বিকশিত হতে চলেছে বলে বিজ্ঞানীদের আশা। এই প্রযুক্তি সর্বোচ্চ ৬ টেরাওয়াট ক্ষমতার শক্তি উৎপাদন করতে সক্ষম। (নেচার ফোটনিকস)

২৩. ●পৃথিবীর বৃহত্তম ত্রিমাত্রিক প্রিন্টার তৈরী করলেন মেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা। এই দানবাকার যন্ত্রে থার্মোপ্লাস্টিক পলিমার ব্যবহার করা হয়েছে যা প্রতি ঘন্টায় ২৩০ কেজি কাগজে প্রিন্ট করতে সক্ষম। কাগজগুলি ২৯ মি. লম্বা ও ৯.৮ মি. চওড়া। (বিবিসি নিউজ)

২৪. ●মাত্র ১৫০ মিনিটে হীরক তৈরী করার পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন বিজ্ঞানীরা। প্রকৃতি হীরক তৈরী করতে সময় নেয় কয়েক লক্ষ বছর। মাটির নীচে অতি উচ্চ চাপে সেই হীরা তৈরী হয় কার্বন পরমাণু হতে। বিজ্ঞানীরা গলিত ধাতু সংকরের (গ্যালিয়াম, লোহা, নিকেল ও সিলিকন) সঙ্গে মিথেন ও হাইড্রোজেন মিশ্রনের বিক্রিয়ায় তৈরী করেন এই কৃত্রিম হীরা। সাধারণ চাপ ও প্রায় ১০২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এই হীরা প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। (নেচার)

সংগঠন সংবাদ

বিজ্ঞান মনস্ক'র কর্মশালা ঃ গত ৭ই এপ্রিল রবিবার সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সংগঠনের কিছু সদস্য ও আমন্ত্রিত আগ্রহী কিছু মানুষ ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ৫০ জন এই কমশালায় উপস্থিত ছিলেন। উক্ত কর্মশালায় আলোচ্য বিষয় ছিল – ১) সোলার নেবুলা সৃষ্টি, ২) পৃথিবীর সৃষ্টি, ৩) মহাদেশ ও মহাসাগরের সৃষ্টি, ৪) পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি, ৫) প্রাণের বিবর্তন ও ৬) মানুষের বিবর্তন। তিনজন বক্তা উক্ত বিষয়গুলির ওপর বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। সৃষ্টিতত্ত্বের প্রবর্তন ধারণা, ধর্মীয় ধারণা ও মানুষের বিশ্বাস ভিত্তিক ধারণা কেমন ছিলো এবং পরবর্তীতে তা বিজ্ঞানের আলোয় এসে কিভাবে পরিশোধিত হয়েছে তা আলোচনায় উঠে আসে। উপস্থিত প্রায় সকলের বিভিন্ন বিষয়ে ছিল বিভিন্ন জিজ্ঞাসা। এইভাবে তারা আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। পৃথিবীর মহাদেশ ও মহাসাগরের বিন্যাস আজ আমরা যেমন দেখি, অতীতে তেমন ছিল না। আগামীতেও এমন থাকবে না। প্রাণের বৈশিষ্ট্যর ক্ষেত্রেও এই শিক্ষার প্রসারই হল বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার। এটাই ছিল আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। এই আলোচনার বিষয়বস্তু আগামী দিনে মানুষের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। ■

নড়িদানা স্বপ্ন সন্ধান ঃ গত ১৪ই এপ্রিল 'নড়িদানা স্বপ্ন সন্ধান' তার লাইব্রেরি উদ্বোধন করে। ঐ দিন অন্যান্য কিছু সংগঠনের সাথে 'বিজ্ঞান মনস্ক'কেও আমন্ত্রণ জানান হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে তাদের অভিভাবকদেরও বিজ্ঞান মনস্ক করে তোলার জন্য তাদের এই প্রয়াস। 'বিজ্ঞান মনস্ক'র প্রতিনিধি 'সমীক্ষণের' পাশাপাশি বিজ্ঞানের কিছু বই তাদের লাইব্রেরিতে দেন। উক্ত প্রতিনিধি আমাদের সংগঠনের কর্মকান্ড, লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। তার বক্তব্য সকলেই গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনেন। ■

আইনস্টাইন ও বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ ঃ

গত ৪ঠা মে বেহালা ঠাকুরপুকুর অঞ্চলে বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী ও উৎসাহী পাঠকদের নিয়ে একটি সেমিনার হয়। উক্ত সেমিনারে বক্তা অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সাথে কথপোকথনের মাধ্যমে আইনস্টাইনের জীবনের বেশ কিছু দিক তুলে ধরেন এবং বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে আলোচনা করেন। এই সেমিনারের আলোচ্য বিষয়ের প্রথম অংশ 'আলাপচারিতায় আইনস্টাইন ও তাঁর আবিষ্কার' নিবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া এ দিন বহ্নিশিখা নামক সংগঠনের উদ্যোগে শ্রুতিনাটকটি ছাত্র-ছাত্রীরা উৎসাহের সঙ্গে আবার পরিবেশন করে। এই নাটকটি ছিল বিজ্ঞানের প্রথম শহীদ ব্রুনোর জীবন আধারিত।

মে দিবসের অনুষ্ঠান ঃ ১লা মে আয়োজক কমিটির অংশ হিসাবে 'বিজ্ঞান মনস্ক' কোথাও এককভাবে আলোচনা সভা কোথাও অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের সাথে পথ সভা, মাইকিং ইত্যাদি কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ছিল। ■

পরিবেশ দিবসে বিজ্ঞান মনস্ক ঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবসে (৫ই জুন) সকলের জন্য খাবার, থাকার জায়গা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রোজগার ও নির্মল প্রাকৃতিক পরিবেশের দাবিতে পথে নামে আমাদের সংগঠনের বিভিন্ন ইউনিট। আমাদের সংগঠন একটি লিফলেট প্রকাশ করেছিল। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার পাথরপ্রতিমা, লক্ষ্মীকান্তপুর, গোচরণ, সোনারপুর এবং উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বনগাঁ, বারাসাত, কলকাতার বেহালা ঠাকুরপুকুর, পুরুলিয়া, উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি ও কোচবিহারের ডাঙ্গারহাট ইউনিট কর্মসূচী নেয়। সর্বত্র লিফলেট প্রচার ও জনে জনে কথাবার্তা বলা হয়। পথসভা হয় পাথরপ্রতিমা, লক্ষ্মীকান্তপুর ও বেহালা ঠাকুরপুকুরে। বারাসাতের একটি লাইব্রেরিতে আমাদের কর্মীরা লিফলেট পাঠ ও বক্তব্য রেখেছেন। ■

পরিবেশ দিবসে গোচরণে প্রচার

পরিবেশ দিবসে সোনারপুরে প্রচারপত্র বিলি

ছড়া ঃ

ভূতের ডেরায় হানা

– তন্ময়

মন করে খুঁতখুঁত, ওই বুঝি এলো ভূত
গা করে ছমছম, বুক করে ধুকপুক,
সবটাই মানসিক; ভয় পেলে ভূত আছে
ভয় নেই ভূত নেই, কল্পনা সব মিছে।

নানা মৌলিক পদার্থ শরীরের উপাদান
অশরীরী আত্মার সেখানেতে নেই স্থান,
জৈব রসায়ন ক্রিয়া থেমে যায় চিরতরে
জীবনের মৃত্যু হয়, মগজেতে নাও ভরে।

ভূত দেখা, ভূতে ধরা যে রোগের লক্ষণ
হিস্টিরিয়া, সিজোফ্রেনিয়া, হ্যালুসিনেশন,
আত্মা প্রেতাত্মা সব মনগড়া ভাবনা
যুক্তিকে সাথী করে ভূত ডেরা দাও হানা।

ভূত সত্য নয়, ভূতের গল্প হয়
মন সাহসী হলে সত্যের হবে জয়,
এতকিছু বললাম, বুঝতে পেরেছ কি
তবে চলো আমরা হানাবাড়ি হানা দেই।

●*শেষাংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়*

মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ

যুক্ত হওয়ার ক্ষমতা শূন্য। এটাও হচ্ছে তাদের প্রত্যেকের পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ইলেকট্রনের আদান-প্রদানের মধ্যদিয়ে পরমাণুগুলির পরস্পর যুক্ত হওয়ার ক্ষমতা তৈরি হয় অর্থাৎ যোজ্যতার কারণ কিছুটা পরিষ্কার হওয়ায় মেন্ডেলিফ যেমন যোজ্যতার ভিত্তিতে তাঁর পর্যায় সারণীকে সাজিয়েছিলেন, হেনরি মোসলিও সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই একে সাজালেন। **মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণীতে যেমন পরিমাণে গুণাত্মক রূপান্তর আমরা পারমাণবিক গুরুত্বের ভিত্তিতে লক্ষ্য করেছিলাম, এবারও তাই হল। কিন্তু এখানে পরিমাণের গুণাত্মক রূপান্তর হল পারমাণবিক সংখ্যার ভিত্তিতে।**

এখানে যে পরিমাণের গুণাত্মক রূপান্তর হল, সেই পরিমাণ বা গুণ সব সময় বিপরীতরূপে হাজির। যখন আধান বা চার্জরূপে দেখছি, তখনও ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক চার্জ, যখন কণা হিসেবে দেখছি তখনও বিপরীত আধান বা চার্জ সম্পন্ন কণা, যেমন ইলেকট্রন ও প্রোটন। রাসায়নিক পরিবর্তন যে গতিময়তাকে উপস্থাপন করে এবারে জানলাম সেই গতিময়তার কারণ দুই বিপরীতের (নিস্তড়িৎ পরমাণুতে উপস্থিত দুই বিপরীত ইলেকট্রন ও প্রোটনের পরিমাণের) পরিবর্তন জনিত কারণে হয়ে থাকে, নতুন আবিষ্কৃত বিজ্ঞান বিপরীত সমূহের ঐক্য ও তাদের পরিমাণের পরিবর্তনের কারণে গতিময় হয়ে ওঠার নিয়মকেই আরো স্পষ্টভাবে তুলে ধরলো।

হেনরি মোসলির আবিষ্কৃত আধুনিক পর্যায় সারণীর চেহারার অনেক পরিবর্তন পরবর্তীকালে হয়েছে, যাকে সর্বশেষ দীর্ঘ পর্যায় সারণী (Long form of periodic table) বলা হয়। এই পরিবর্তনগুলো কেন হল সে প্রসঙ্গে পরবর্তীতে আসবো। এই পরিবর্তনকে অবশ্যই মৌলের পরমাণুর আকার, আকৃতি, গঠন সম্পর্কে মানব ধারণার বিকাশের সাপেক্ষে বিচার করতে হবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এই বিজ্ঞানী মারা যাওয়ায় তাঁর কর্মকান্ড আর এগোয়নি। পরবর্তীকালে তা এগিয়ে নিয়ে যান বিজ্ঞানী নিল্‌স বোর। (ক্রমশ)

সহযোগিতা রাশি ঃ ১৫.০০ টাকা

Registration No.: SO197407 of 2012-13

পরিবেশ দিবসে পথসভা, লক্ষ্মীকান্তপুর

পরিবেশ দিবসে পথসভা, পাথরপ্রতিমা

বারাসাত লাইব্রেরিতে পরিবেশ দিবস উদযাপন

পিটার হিগ্‌স স্মরণে সভা (বেহালা ঠাকুরপুকুর)

আইনস্টাইনের জীবন এবং
বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ বিষয়ে আলোচনা সভা

বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষে নন্দা মুখার্জী প্রযত্নে অপন মোতিলাল, ১৭৮/এন, বাসুদেবপুর রোড, ঐক্যতান ক্লাবের (বকুলতলা) নিকটে কলকাতা - ৭০০০৬১, কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ৩০, বিধান সরণী, কলকাতা - ০৬ হইতে মুদ্রিত।

সম্পাদক ঃ শিশির কর্মকার – ৯৪৩২ ৩০০৮২৫ প্রকাশক ঃ নন্দা মুখার্জী ঃ ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮

Email : samikshan2009@gmail.com Website : https://samikshan.com